মূল্য ঃ ৫ টাকা

# সত্যের পথ

## যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

জানুয়ারী, ২০২৪
পৌষ, ১৪৩০

# সূচীপত্র

## ২১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

## পৌষ ১৪৩০/জানুয়ারী ২০২৪


| | | |
|---|---|---|
| ভারতেই রয়েছে সব জ্ঞানের উৎস | | ৩ |
| দিব্য ভাব সঞ্চার | অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪ |
| অভিমান খুব খারাপ জিনিস, মা | মনোজ বাগ | ১৪ |
| সাধকের সাধন পথই ভগবান লাভের সত্য পথ | মানবেন্দ্র ঠাকুর | ১৮ |
| শ্রীগণেশ চতুর্থী | সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি) | ২০ |
| জপের-মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ | স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায় Vedic Priest, শিলিগুড়ি | ২১ |
| শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে | আশুরঞ্জন দেবনাথ | ২৩ |
| অন্তর মাঝে তাকে পাওয়া যায় | সায়ক ঘোষাল | ২৫ |
| আবাহন করি তোমায় হৃদয়রাজ | তানিয়া ঘোষাল | ২৫ |


---


**সম্পাদক :** **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**প্রকাশক ও মুদ্রক :** **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**মুদ্রণের স্থান :** ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**দাম :** **৫ টাকা**



**সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**
**ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী**
**ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি**
**(চতুর্থ তল)**
**কোলকাতা—৭০০ ০৯১**
**দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩**
**(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট**
**সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)**

**সাক্ষাতের সময় ঃ**
**রবিবার বিকেল পাঁচটার পর**

**সম্পাদকীয়**

# ভারতেই রয়েছে সব জ্ঞানের উৎস

জীবন পথের এই চলমান ঘটনাগুলির মধ্যে স্থিত রয়েছে দীর্ঘ কালব্যাপী অনন্ত কালসীমার যে প্রবাহ তাকে বরণ করে নেওয়া কোনও একটি উপায়ে। কালাতীত হয়ে বিরাজ করে চলেছেন মহাকাল স্বয়ং। মহাকালের এই যাত্রাপথে গড়ে উঠেছে যত জীবন প্রবাহ ততই হয়ে উঠবে দেব চরিত্রের গড়ন। দেবচরিত্রের এই গড়নের মধ্য দিয়ে ভগবানের নবীন আহ্বান দেবজীবনের অধিকারী হয়ে ওঠা। দৈবজীবন স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র। দেবজীবনের এই স্বাতন্ত্র উপাধি সূচক নয়, এটির রয়েছে বিপুল ব্যাপ্তি বিশ্ব চরাচরময়। এই ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে নিপুন এক আবহ। ছন্দে-তরঙ্গে এই দিব্য আবহ হয়ে যায় নিত্য প্রসারিত। এই প্রসারণের পর্বে পর্বে পাশবিক মনের প্রভাব পড়ে আছড়ে। স্বতঃই বিশিষ্ট হয়ে যায় এই স্বাতন্ত্রের দেবচরিত্রটি। যেমন করেই হোক এই দেবচরিত্রের বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে। দেবচরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট হল সত্য-ঋতের উপর হওয়া প্রতিষ্ঠিত। যে সত্য ও ঋতকে বরণ করে নিয়ে ক্ষণকালের প্রদীপটি যেন মহাকালের দিব্য আলোক প্রভায় হয়ে ওঠে আলোকিত। দেবপ্রদীপে আলোকিত জীবন তখনই সাময়িকের গণ্ডী পেরিয়ে হয়ে যায় অনন্ত মহাকালের এক একটি অঙ্গ। মহাকালের অঙ্গ হয়ে সে চরিত্র হয়ে উঠবে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব — Magnanimous Personality! বিশিষ্ট এই ব্যক্তিত্ব নতুন জীবনের আহ্বায়ক।

"The magnanimous man, since he deserves most, must be good, in the highest degree; for the better man always deserves more, and the best man most. Therefore the truly magnanimous man must be good. And greatness in every virtue would seem to be characteristic of the magnanimous man. And it would be most unbecoming for the magnanimous man to fly from danger, swinging his arms by his sides, or to wrong another, for to what end should he do graceful acts, he to whom nothing is great? "Magnanimity, then, seems to be a sort of crown of the universe virtues; for it makes them greater, and it is not found without them. Therefore, it is hard to be truly magnanimaus, for it is impossible without and goodness of character. It is childly with honours and dishonours then, that the magnanimous man is concerned, and at honours that are great and confirmed by good men he will he moderately pleased..."
(Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Routledge, London, New York, 1946,
2018, P. 170, quoting Aristotle's Ethics, 1123-1125.)

পাশ্চাত্যের জীবনবোধ ও জীবনধারায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জগতের জড় অধিকার আর জড় নিবেদনের জন্য বিশেষ অধিকারের দাবী চলে আসে জগতের বেড়ে চলবার পথে, জগৎ এই বহু বৈচিত্রের এক সম্মিলিত ক্ষেত্র। বিশেষত্বের অধিকারী ব্যক্তি সার্বিকভাবে জগতের বৈভব ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে জগৎ মাঝে বিপুল প্রভা ও প্রভাবের আকর্ষণে এগিয়ে চলে। জীবনের স্ফূর্তি, সন্তোষ, আনন্দ জগতের ঐশ্বর্যলাভ প্রভাব বিস্তার, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জগৎময় বিস্তৃত এক জড় পরিচয়ের বিশেষত্ব অর্জন করবে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

জগতের সাপেক্ষে পাশ্চাত্যের জীবনবোধ সাময়িকের তৃপ্তি সম্পাদনকারী আর জগতের পটভূমিতে জড় উপাদানের বিশেষত্বই যেন গড়ে ওঠে। জগতের পটভূমিতে এই বিশেষত্ব ব্যক্তির জড় পরিচয়ের পরিধিকে আরও ব্যাপতর করে গড়ে নিজের ব্যক্তি পরিচয়ের বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তৎপর।

ঋষির প্রত্যয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনে সত্যকে বরণ করতে পারা বিশিষ্টতা অর্জনের পথ। সত্য-জ্ঞান-অমৃত চেতনকে বরণ করে নেয় যে জীবন সেই জীবনই বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন ব্যক্তি তার গুণাবলীর দ্বারা নিজের ব্যক্তি পরিচয়ের বিশিষ্টতা হল পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট, আর ঋষির প্রজ্ঞাপথে হয়েছে নিজের সত্য-ঋত পরিচয়ের নিরীখেই গড়ে ওঠে সঙ্গা। সত্য-জ্ঞান-অমৃতচেতনের অধিকারী ব্যক্তিই বৈশিষ্ট তার অধিকারী। Magnanimous এই দিব্য চরিত্র শুধু বিশিষ্ট নয়, জগতের মাঝে ভবিষ্যতের জীবনবীজ নিহিত রয়েছে এই সত্য ও ঋত পথেরই মাঝে। দৈবী গুণের সমাহার যদি সত্যই একটি জীবনে গড়ে ওঠে সেই জীবন তবেই হয়ে ওঠে জীবনের স্ফূর্ত ও পূর্ণতা। জীবনের পূর্ণতার এই বোধ স্বতঃই জীবনকে গড়ে দেবে নবীন আবর্তে। জগতের মাঝে তোমার দিব্য জীবনের এই পরশ জগতের জড় প্রকাশ আর জড় প্রবাহ স্বতঃই এক স্পর্শমণির স্পর্শেই হয়ে উঠবে দিব্যসাধন আর দিব্য গুণসম্পদধর্মী জীবনে, জগতে।

—ঃঃ—

# দিব্য ভাব সঞ্চার

**অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**মানবিক ভাব ঃ** মানবিক ভাবই স্বাভাবিক। জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা, হাসি-আনন্দ এসব পেরিয়েই যেতে হয় ভগবানের পথে। যাওয়াটি কঠিন নয়, আবার তেমন সহজও নয়। জীবনের স্রোতপথের ওঠানামার মধ্য দিয়ে যদি কেউ সত্যিই কষ্ট স্বীকার করে ভগবানের পথে এগোতে পারে তবে তার হবেই। ভগবানকে ধরে থাকবার চেষ্টা করতে হয় মনের সব আবেগ, প্রাণের সব আকূতি, আর যদি ভাগ্যক্রমে সম্ভব হয় হৃদয়ের কিছু ভালবাসা দিয়ে। মনের আবেশগুলি প্রায় সবই খরচ হয়ে যায় জাগতিক প্রসঙ্গে। রাগ, দুঃখ অভিমান অবসাদ ঘৃণা বিদ্বেষ লোভ মোহ—এ সবই মনের নৌকায় জীবনের এই বিশাল সময়ের স্রোতকে পাড়ি দেয়। প্রতিটি আবেশ কণার পিছনে থাকে সময়ের সরণি পেরিয়ে আসা নানা ধেরনের যুক্তির উপকরণ। প্রতিটি যুক্তির ভিত্তিতে রয়েছে এক একটি অথবা বহু কণাময় ইতিহাসের সম্পদ। যিনি জগতের মাঝে চান হতে এই আবেশের তাড়না থেকে মুক্ত তাঁকে হতে হবে দৃঢ় কড়া কঠোর। দৃঢ় হতে হবে নিজ চেতনার প্রতি বিন্দুতে করতে হবে প্রবেশ। মাখতে হবে জগতের ধূলি-কণা সব। জগৎ চেতনে হয়ে পুরো মাত্রায় ভরপুর হতে হবে নিরাসক্ত। যা কিছু রয়েছে জীবনের অপূর্ণতা এপর্যন্ত সে সবকেই ভুলতে হবে; নিতে হবে করে বরণ ভগবানকে আপন যেন বাবা-মা।

Consolation is possible only if hope is possible, and hope is possible only if life makes sense to us. If genuinely believed that life were absurd, one random event after another, without let up or respite, ending in death, then resignation, heedless pleasure, flight, suicide – anything at all – would make sense, but not consolation. The hope we need for consolation depends on faith that our existence is meaningful or can be given meaning by our efforts. This is the faith that allows us to live in expectation of recovery and renewal. Consolation depends on that faith and is thus an unavoidably religious idea, even if, the meaning that give us hope can be non-religious and even anti-religious forms. Yet it is with the religious search for the meaning of suffering that we must begin. Religions fulfil many functions but one is to console, to explain why human begings suffer and die and why, despite these facts, we should live in hope.

(Michael Ignatieff, On Consolation-Finding Solace in Dark times, Picador, 2021, p. 9.)

মনের কার্যাদির আবার বিশ্বাসযোগ্যতা একটু কম। মনের চঞ্চল সঞ্চার অথবা মনের মাঝে ফুটে ওঠা সদ্ বস্তুর মান্যতাই পেতে মনকে হতে হবে ক্রমশ প্রসারিত। গণ্ডী বাড়াতে হবে মনের। হতে হবে শক্ত মনের-সদা। মনের প্রসারতা বলে এই বিষয়কে বলা যেতে পারে। প্রসারতার মূল ভাবটি হল নিজেকে নিয়ে চর্চার পরিমাণ ক্রমে সঙ্কোচন করে বাড়াতে হবে অন্য বিষয়। যেমন, নিজের পরিবর্তে ভাবতে চেষ্টা করতে অন্যের বিষয়। নিজের যা কিছু প্রসঙ্গ বা বিষয়ের আকর্ষণে মন মজে ছিল তার যতটা সম্ভব লাঘব করে ফেলা। যখনই আসবে নিজের প্রসঙ্গ — যেমন জীবনের জন্য পাওয়ার হিসাব অথবা পেয়ে হারাবার ভয়ের দ্বারা তাড়িত মন সর্বদাই নিজের চারদিকে ঘুরপাক খেতে থাকবে। এসব সর্বদাই মনের মাঝে নানা রঙের ঘর করে ফেলে। কখনও যদি মনের এই প্রতীতি হল যে এই জীবনের সার হল ব্যর্থতা। বিজয় যদি ভাবতে হয় তবে এক্ষেত্রে মনই পাখি হয়ে মালা গলায় পরে উড়ে যেতে পারে আকাশে। আকাশের পটভূমি থেকে জেগে উঠবে কোনও কে অনির্বচনীয় যাকে নিয়েই তৃপ্তি লাভ করতে পারবে মন।

অন্যদিকে রয়েছে এই বিশ্বমাঝে ছোট-বড় সবই এই পরিমণ্ডলের স্থায়ী ও বিশেষ প্রাণশক্তিকে পারে বহু ব্যাপ্তির মাত্রা। জীবনের জন্য ব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে এই জগতের মাঝে প্রকৃতির সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে জগৎময় ব্যাপ্ত করতে হবে সক্ষম। এটি হবে জগতের ক্ষেত্রে একক প্রাণের ভাব প্রাচুর্যের প্রকাশ পর্ব। মানবিক মন যখন প্রাণের শক্তি পেয়ে যায় তখনই ফুটে ওঠে ব্যাপ্তির বিষয়টি। নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে যখন জীবন-প্রাণ সঞ্চালন হয় তখন এই পর্বটি ক্রমে ভারতের অতি প্রাচীনকালের মধ্য থেকে সত্য খুঁজে আনা যেন অতি সহজ হয়ে যায়। মনের প্রাণের সব জড়তা ও আবিলতা মুক্ত। এই পটভূমিতে ভাবের হয় বিকাশ। ক্রমে ফটে উঠবে পূর্ণ সত্যের ভাবপথের আহ্বান।

**নবীন বিকাশ প্রয়াসে ঃ** প্র নূনং জায়তাময়ং মনুঃ।
তোকম্ এক রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাংশ চ সদ্যৌ দানায় সংহতে।। (ঋ. বে. ১০/৬২/৮)

বিশ্বমাঝে হোক ব্যাপ্ত তোমারই চেতনার প্রদীপ।
এই বিপুল ভাবনার রথ করুক আহ্বান তোমায় জগৎ মাঝে।

যেমন দিয়েছ প্রেরণা জীবনের জাগরণ তরে এই ক্ষণপ্রভায়
যেমন হয়েছে তোমারই এই প্রবাহ জীবন মাঝে স্বতঃই
তেমনি হোক তোমারই জগৎ বিকাশ বিপুল প্রাচুর্যে।
মানবের এই বিকাশ বৈচিত্রের হোক দেবী চরিত্রের উন্মোচনে।
ঐ মহান দেবস্পন্দনের হোক এখন ব্যাপ্তি এই বিপুলে।
দাও তোমারই আশীষ জীবনের মধ্যে বিকাশে, বিবর্তনে।।

**জগৎ মাঝে অনন্ত শক্তির প্রবাহ ঃ**

ন তম্ শ্রোতি কঃ চন।
দিব দিব ইব সানু শানু আরম্ভম্।
সঃ অবর্ণঃ অস্য দক্ষিণা বি সিন্ধু ইব পিস্রথে।। (ঋ. বে. ১০/৬২/৯)
তোমায় দেখেছি ঐ উর্দ্ধ আকাশের উচ্চ পর্বে
তোমায় পেয়েছি নিত্য বিকাশের এই জীবন স্রোতে।
এখন এসেছে জগৎ বিস্তৃতির এই পর্বে স্বতঃ নিষ্কাষণে।
তোমারই এই অনন্য প্রকাশ দীপ্তির বিপুল প্রভায়।
দাও হে দেবতা তোমার অনন্য কৃপাশক্তির পরশ জাত।
এসেছে এখন ঐ বিপুল প্রকাশের দিব্য প্রবাহের আহ্বানে।
যতই চেয়েছে জগৎ তোমারই হতে ততই জেনেছে জগৎ মাঝে।
অনন্ত তোমার এই সত্যের হোক জাগ্রত এই জগৎ চেতনে।।

**জীবনে জ্ঞান সঞ্চারে পথ পরিক্রমায় ঃ**

উত দাসা পরিচিতে প্রজ্ঞাময়ম্
অস্মাৎ ধৃষ্ণ গোপহীনসা।
যদুঃ যৎ উস তুর্বঙ্গ চ সামহে।। (ঋ. বে. ১২/৬২/১০)
ছিল যা কিছু সম্পদ জগতের তরে হয়ে পূর্ণ।
হয়েছে যে ভাব প্রদীপ বিশেষ বিকাশে বিকশিত।
এ জীবন মাঝে এসেছে যে প্রাণপ্রদীপ নিত্য প্রকাশে
হোক তার স্বতঃ দীপ্তি নিত্য বিকাশের প্রত্যয় যোগে।
দেবতার কৃপায় এসেছে যে ভাবদীপ্তি বিকাশের তরে
হয়েছে তাঁরই নিত্য প্রবাহ জগতের এই বেড়ে ওঠায়।
তোমারই ভাবপ্রদীপ হয়েছে উন্মোচন নিত্য এই সাধনে।
এখন আসুক ভাবপ্রদীপ তোমায় বরণে এই যজ্ঞের জীবন পর্বে।

**অনন্য ভাবপ্রকাশে ঃ**

সহস্রদা গ্রমনীর্মা রিযনঃ মনুঃ
সূর্যেন অস্য যজমানঃ এতু দক্ষিণাঃ।
সাবর্ণ দিব্য নিরন্ত বায়ুঃ।
যস্মিন্ নক্ষত্র প্রান্তা বায়ুঃ। অসমান-বাজম্।। (ঋ. বে. ১০/৬২/১১)
সৃষ্টির প্রবাহে অক্লান্ত মনুর এই সংযোজনে
আসুক ভাবধারা তোমায় করতে বরণ ক্লান্ত পথসেবায়।
ঐ পরম্ প্রকাশের দিব্য জ্যোতির এখন নিত্য সংযোজনে।
এসেছে জীবন মাঝে তোমায় বরণ তরে দিব্য ভাব সংবেদে।
ঐ ভাবদীপ্তির প্রবল প্রকাশ পর্বে হয়ে নিত্য সাথি
আসুক দেবতার এই নীরব উপস্থিতি স্বর্তঃ প্রকাশের পর্বে।
অনন্ত তোমার এই ভাবপ্রকাশ পর্বে তোমার নীরব উপস্থিতি।
যেমন করে হয়েছে দৃপ্ত দৃক নবীন প্রকাশে।।

মনের শক্তি ও প্রাণের শক্তির সমন্বয়ে মানুষের অভিযান চলতে থাকে জগৎ পথে। জগৎ পথের এই অভিযানে এগিয়ে যেতে হয়

সকলকে। জগতের পটভূমিতে বিজয় ও স্থিতি একদিকে গতিময় প্রবাহ অন্যদিকে আহ্বান করে নিয়ে আসে জগৎ মাঝে প্রতিষ্ঠার পর্ব। জগতের এই প্রতিষ্ঠা স্বতঃই হয়ে ওঠে সুখের, তৃপ্তির, পছন্দের। ব্যক্তি মানুষের জীবনপথে যা কিছু রয়েছে জীবনের স্বাদ বা জীবন বিষয়ে আগ্রহ আর আকর্ষণ সবেরই মূলে আছে জীবনের পর্ব ও জীবন কণার সুখাস্বাদ। যেন মনে হবে সবই কত সুখর। এই সুখ আর তৃপ্তি জীবনকে ধরে রাখে; টান টান আকর্ষণে টেনে রাখে। এই আকর্ষণই জীবনকে টেনে রাখে। আকর্ষণের রকমফের রয়েছে দেহের আর জৈব রসনার তৃপ্তির জন্য কে ধরনের আকর্ষণ, ভোজন তৃপ্তির জন্য ভিন্ন আকর্ষণ, জীবনের প্রতিষ্ঠার সবরকম দিকের জন্য অন্য আকর্ষণ; অর্থ-সম্পদের জন্য ভিন্ন ধরনের আর নাম-ডাক-সম্মানের জন্য আরও ভিন্ন ধরনের। এ সব আকর্ষণই হয় সুখের। প্রতিটি সুখের কণার সঙ্গে যোগসূত্র হয়ে রয়েছে এর সঙ্গে অভিন্ন বন্ধত্বের আর এক উপহার। সুখের সবচেয়ে বড় বন্ধু হল দুঃখ বা বেদনা। সুখ যদি বিরাজ করে তবে পিঠোপিঠি চলে আসে দুঃখের উপহার। অবশ্য এর জন্য কখনও সুখের লালসা থেমে থাকে না।

The Lord is my shepherd; I shal not want.
He maketh me to lie down in green pastures; he leadeth me
beside the still waters.
He restoreth my soul; he leadeth me in the paths of righteousness
for his name's sake.
Yeh, though I walk through the valley of the shodow of death,
I will fear no evil : for thou art with me; thy rod and
thy staff they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of my enemies :
thou anointest my head with oil; my inprunneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my
life : and I will dwell in the house of the lord forever.
(Michael Ignatieff, On Consolation - Finding Salace in Dark Times, Picador 2021, p. 17)

জীবনের এই পথচলায় যদি মতি আসে ভগবানে তবে এই সব সুখ-দুঃখের বালাই ঘুচে যায়। ভগবানে যদি মতি আসে তবে কখনও ফুটে ওঠে ভাললাগার পর্ব। একটু একটু করে ভগবানের বিষয় যদি ভাল লাগতে শুরু করে; যদি বা কখনও সখনও ভালবাসা উঁকি দেয় তবে বুঝতে হবে কৃপার আবহ একটু একটু করে ফুটে উঠছে। কৃপার সূচনা হলে তাকে বিশ্বাসের আবর্ত দিয়ে বাঁধতে হয়। বিশ্বাস যদি কৃপার পর্বে আসে তবে বুঝতে হবে যে কৃপা ক্রমশঃ মজবুত হচ্ছে। কৃপার প্রবাহ সূচনা হলে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন হয়ে যায়। অবশ্য হৃদয় বৈশিষ্ট হল — এটি সদা স্থির থাকতে চায় না। সাধারণভাবে হৃদয় দ্বার উন্মোচন হয় জাগতিক ভাবাসার জন্য। মানবিক ভালবাসার গভীরতা যতই বাড়তে থাকে হৃদয় বৈশিষ্ঠ ততই ঐ ভালবাসার জন্য যেন যুক্ত করে দেবার রসায়ন রচনা করে। এমন রসায়ন যার ভিত্তি খুবই মজবুত। এটি মানবিক সম্পদে থাকে সম্পৃক্ত। জীবনের পথ চলায় জগতের যত সম্পর্ক বা আপনত্বের বা বন্ধুত্বের বোধ রয়েছে হৃদয় ক্ষেত্র সর্বত্র হয়ে যায় উন্মুক্ত ভাবদীপ্তি যাই হোক্ সম্পর্কের বর্ণনা যেমন হৃদয়রস হয় তেমনই। এমন করেই হয় জীবনের পর্বে পর্বে নানা ধরনের সম্পর্ক আর ভালবাসার প্রবাহ। ভালবাসা স্বতঃই জীবনের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে। এমন করে হৃদয় তার রসায়ন বিন্যাসে মানুষকে যুক্ত করে রাখে। তখন মনে হয় এটি পরম শান্তি আর সুখের জগৎ ক্ষেত্র।

এসব সম্পর্ক আর জগৎ ক্ষেত্র সম্পর্কে সব ধারণার বিস্তৃতি ক্রমে এগিয়ে চলে নিত্য বিবর্তনের পথ দিয়ে। আজ যে সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন, আগামী দিনে সেই আপনত্বের বোধ সরে যায় ফুটে ওঠে এক নিরানন্দবৃত জগতের সব বিষয়। হৃদয়ের আবেগ কখনও প্রকাশিত হয় আবার কখনও গোপন। জৈব লালসার বিষয়াদির থাকে খুব শক্তিময় অস্তিত্ব। এমন শক্তিময় প্রবাহকে সহজে ক্ষুণ্ন করা যায় না।

ভগবানের ভাবে— রপ্ত হয়ে যখন মনের মাঝে আর প্রাণের শক্তির আনুকূল্যে ভগবানকেই পেতে চাইবে। যখন মন-প্রাণ হবে ব্যাকুল; যখন সত্যি সত্যি আর কোনও আকর্ষণ থাকে না; থাকে শুধু ভগবৎ আকর্ষণ একমাত্র তখনই ভক্তির হৃদয়দ্বার হয় উন্মোচন। আর অন্য আকর্ষণ তখন সব ঝরে যায়। থাকে শুধু একমাত্র ভগবান জীবন মাঝে।

**বাসনার গণ্ডী** পরাবত যো দিধিষন্ত।
**করে অতিক্রম ঃ** অন্যং মনুপ্রীত অসৌ। জনিমা বিবস্মতঃ।।
যযাতেঃ তে নহুষস্যঃ বর্হিষিঃ দেবা
আসতে তে অধি ব্রবন্তঃ নঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১)

এখন মানব জনের মাঝে হয়েছে বিচিত্র সংগঠন।

যা কিছু হয়ে জীবনের চাওয়া এসেছে জীবনের মাঝে
হয়েছে সব দেব আর জড় চাওয়ার বিচিত্র প্রকাশ
যযাতির জীবনে পিতা নহূশ হয়েছে প্রকাশ আদর্শ।
বিবস্বান মনুর এখন হয়েছে নতুন উন্মেষ জগতে।
যযাতির উৎস পথে রাজবৃত্তের পরিসরে এখন চাওয়া
যযাতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে নবীন আবাহনের ক্ষেত্র।
হোক উদার প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাগবতী উন্মেষ।।

**মানবের দেবমিলন প্রয়াসে ঃ**

বিশ্বা হি বে নমস্যাণি বন্দ্যানি নামানি।
দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যঃ স্থানম জাতা অদিতেঃ অতব্যঃ পার যে
পৃথিব্যাঃ তে মহ ইহ শ্রুতা হবম্।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/২)

দেবতা তোমার এই সৃষ্টির মাঝে যত ভাব আবির্ভাব।
হয়েছে তার পার্থিব পরিচয় বৃত্তে স্বতঃই শূন্য হয়ে হওয়া।
যা কিছু জ্ঞানের মহিমা হয়েছে তোমারই সহজাত।
হয়েছে এখন উজাড় উন্মোচনের এই পর্বে ভক্তির প্রসার।
নিয়েছে যদি মানব পরিচয় করে অঙ্গীকার পার্থিব বিকাশে
হয়েছে ব্যাপ্ত ঐ পরিচয়ের মানব চেতনের সদা বিকাশ।
তোমারই সাধন পথে তোমায় করে বরণ পরম একান্তে।।

**মধুময় দিব্যচৈতন্য ঃ**

যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পথঃ।
পীযুষং দ্যৌ অদিতিঃ অদ্রিবর্হাঃ।
উক্থ্ শুষ্মান্ বৃষভরান্ সু অপ্রসঃ।
তান্ আদিত্যাং অনু সদা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৩)

এই বিশ্বমাঝে দিয়েছ তুমি অমৃতের ধারা
যে চেয়েছে হয়ে উন্মোচিত ভক্তির এই পথমাঝে তোমায়।
ভগবৎ ভাবপ্রদীপ দিয়েছে ঐ উন্মুখ বিকাশের পর্বে।
এখন আসুক তোমারই আহ্বানের দৈবী চেতনের সূত্র।
যেমন করেই চেয়েছ তুমি এই জগৎ সৃষ্টির পটে
অমৃতের এই ভাবসঞ্চার করেছ তুমি স্বতঃই সৃষ্টিতে।
ভক্তির আবাহনে একান্ত নিবেদনে হয়েছ যদি প্রস্তুত তোমায় বরণে।
তবে এসেছে তোমারই কৃপাশক্তির প্রবাহ তোমায় গ্রহণে।

**আলোর বাহনে ঃ**

নৃ চক্ষসো অনিময় ইষন্তী অর্হনা।
বৃহৎ দেবাসো অমৃতঃ তত্ত্বমানশুঃ।
জ্যোতিঃ অথ অহিমায়া অনাগসৌ
দিবঃ বষ্মানং বসতে স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৪)

দেবতার দান এই নিত্য উজাড় করা চেতন বিস্তার
দিয়েছে প্রেরণা জগতের মাঝে তোমায় করে বরণ।
এখন যে ভাব বিন্যাস হয়েছে অনন্যতায় বিধৃত
তোমায় করেছি নিত্য আহ্বান এই জগতের কর্মে-জ্ঞান-ধ্যানে।
আলোর বাহনে এসেছ যদি এই জীবনের মাঝে
কর উন্মোচন আলোর মাত্রা জীবন পথের প্রসারে।
এখন হয়েছে তোমারই প্রেরণার দান এ জীবনের প্রসারে

দাও হে পরম নিত্য চেতনের মূর্ত আবাহনের রথ প্রকাশ।।

জীবনের পথচলাটি সাধারণভাবে উথাল-পাথালে ভরা। কখনও আকাশের পটে আবার কখনও বা পাতালের গহ্বরে। যতই হোক চেষ্টা ওঠানামা রোখা কঠিন। ভগবানের শরণ যে প্রাণ নেবে তার বিষয়টি স্বতন্ত্র। হৃদয় মাঝে যদি ভগবানের জন্য ভালবাসা তৈরী হয় একটু পরিমাণে, তৎক্ষণাৎ ঐ প্রাণের পরিবেশটি বেষ্টিত হয়ে যায় মানবিক স্তরের সব ভালবাসার অঙ্গীকার দিয়ে। মানবিক স্তরের ভালবাসা এতো হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়ে। এখন হৃদয়ের দরজা দিয়ে মানবিক স্রোতগুলি প্রবেশ করে সরিয়ে দিতে চায় ভগবৎ ভালবাসা, ভাগবতী প্রেম। ভাগবতী ভালবাসা ও প্রেম জীবনের মাঝে দানা বাঁধতে পারে যখন আবেদন আসে জীবনের মাঝে ক্রম সঞ্চারে গড়ে নেওয়া বিশ্বাসরে সূত্র ধরে। বিশ্বাসের সূত্র যতই হবে বলবতী, যতই বিশ্বাস হয়ে উঠবে অবিচল ততই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে হয়ে চলা নানা আকর্ষণ আর প্রভাবের চাপান উতোর। যে ভাব মণ্ডল জীবন মাঝে ক্রমে দৃঢ় হতে পারে, যে জীবন সদাই হয়ে ওঠে এক অনন্যতায় ভরপুর তারই একক সূত্রে অন্বীত। ঈশ্বরের করুণাস্পর্শ জীবনের মাঝে যদি আসে তবে হৃদয়ের ভাবমণ্ডল বিরোধশূন্য হয়ে যায়। হৃদয়ের ভক্তি গড়ে উঠতে শুরু করে। জ্ঞানপ্রবাহ শুধুমাত্র যদি একান্তভাবে জীবনের বহির্ভাব মণ্ডলে অন্বীত হয়ে থাকলেও হয়ে যায় ব্যাপ্ত। ব্রহ্ম ভাব জীবনের পথকে করে দেয় সদা বিকশিত হতে।।

Derived from! Facing the Barbarians – Marcus Aurelius

(Between AD 165 and 180 while fighting Barbarians, he used to write notes to himself 'ta eis be' autom' (Greek) – things to oneself in his Meditation as :

This mortal life is a little thing, lived in a little corner of the earth; and little too is the longest fame to come – dependent as it is on a succession of fast perishing little men who have no knowledge even of their own selves, much less of one long dead and gone...

The man whose heart is palpitating for fame affir death does not reflect that out of all those who remember him everyone will himself soon he dead also, and in course of time, the next generation after that until in the end, after flaring and sinking by turns, the final spark of memory is quenched.

(Michael Ignatieff, On Consolation – Finding Solace in Dark Times, Picador, 2021, p. 65.)

জ্ঞান সঞ্চার হতেই থাকে জীবনের পথে। প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে বিন্দু বিন্দু জ্ঞান সঞ্চয় হয় অভিজ্ঞতার পথ ধরে। অভিজ্ঞতার প্রতিটি পর্বই জ্ঞান সঞ্চারী, জীবনের পর্বগুলি সদাই জীবনের জন্য আবাহনী। জীবনের জ্ঞান সঞ্চার সমন্বিত হয়েই কালের সরণিতে হয়ে ওঠে নবীন চেতনের উত্থান। প্রতিটি জ্ঞান কণার সমন্বয়েই নবীন চেতন জেগে ওঠে আর এই জ্ঞান পরিচয় থেকেই এগিয়ে আসে নিত্য পথের জাগরণ প্রবাহ। যে ভাবদীপ্তি জীবনকে এই জগৎ মাঝে করেছে স্থিত ঐ ভাবদীপ্তির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে জীবনের নবীন বিন্যাস। যে জ্ঞান সঞ্চয় হবে জীবন পথে সেটিই বাস্তবের রূপে রঙে যখন ফুটে উঠবে তখন তার পরিচয় বাস্তব জ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। আবার এরই নির্যাস যখন বিশেষ ভাবে প্রত্যয়ের পরিধি প্রাপ্ত হয়ে বিস্তৃত হবে তখন একে বলা হবে অধ্যাত্মিক জ্ঞান। অধ্যাত্মিক জ্ঞানটি দার্শনিক ও প্রত্যয় স্নাত। এর বিশেষ অভ্যন্তরটি কালাতীত ও দেশাতীত হয়ে যায় আবার একেকটি পর্ব সদাই সমকালের জন্য হয়ে উঠবে নিত্য অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। এই সাব জ্ঞানকণা যে অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে এগিয়ে চলে তারই হয়ে ওঠ নিত্য নিরঞ্জনী প্রবাহ। জীবনের পর্বে পর্বে এগিয়ে চলে বিস্তৃত ও বিশদ ভাবাবেশ। যে ভাবপ্রবাহ অন্তর মাঝে, উদ্বোধন করে মানবিক দীপ্তি তারই হয়ে বিশেষ বিকাশ প্রবাহ। যে ভাব বিকাশ হয় এই জীবনের জন্য উপযোগী তারই বিশেষ কিছু অংশ রয়েছে যেটি জীবনের আত্যন্তিক সত্য। আত্যন্তিক সত্য ঐ ব্রহ্মসত্যের কণা বিশেষ হয়ে সাধন জীবনের কাছে ধরা দেয়। যেটি আত্যন্তিক সত্য তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে ব্রহ্মসত্যের বীজ। ব্রহ্ম সত্যই সমকালে প্রসারিত হয়ে ফুটিয়ে তোলে তার মধ্যেকার সম্পর্ক বিন্যাস ও বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই বিকাশ সদাই জীবনের প্রসারণকে চায় সমন্বিত করতে। জীবনের বিকাশ সদাই হয়ে উঠবে সত্য উন্মোচনী। প্রতিটি পর্ব ও ক্ষেত্রই হয়ে উঠবে একটি একটি চেতন কণা যা করে সত্য সঞ্চারী।

**দেবতার প্রকাশে ঃ** সাম্রাজো যে সুবৃধোঃ যজ্ঞম্ আয়যুঃ।
অপরিহবৃতা। দধিরে দিবি ক্ষয়ম্।
তান্ আ বিবাস নমমা সুবৃক্তিভিঃ।
মহো আদিত্যান অদিতিৎ স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৫)

দেবতার প্রকাশ হয়েছে সমন্বিত দেবমার্গে।
হয়েছে বিস্তৃত কর্মের বিভাজনে জ্ঞানের প্রকাশে।
যেমন করে হয়েছে নিত্য দিনের নিত্য স্থিতি এই ক্ষণে

এসেছে ঐ সত্যের নিত্য বিকাশ পর্বে সদা আবর্তনে।
পরম প্রকাশ এসেছে মানবের মাঝে দেব পরিচয়ে
একক পরিচয় হয়েছে বিধৃত পরমের পূর্ণত্বে।
এখন হয়েছে তোমারই নিত্য বিকাশের এই সূত্র
সদা প্রকাশের বিশেষ বার্তার এই নিত্য উন্মোচনে।।

**বিশ্বামাঝে দেববার্তা ঃ**

কিঃ বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজঃ ঔযথঃ।
বিশ্বে দেবাশো মনুষো যতি ইষ্টন্।
কি বঃ উৎ অধরং তুবিজাতা অরৎ কবদ্।
নো নঃ পর্ষদ অন্তং অহঃ স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৬)

দেবতার প্রকাশের দিব্য আলোক এসেছে নিয়ে বার্তা
যেমনই হয়েছে সাধনের বিকাশ প্রয়াস স্বতঃই।
এখন এসেছে নিত্য বিকাশের জগৎ ব্যাপ্তির ক্ষণ।
যে ভাবদীপ্তি ছিল সদা প্রত্যয়ের নিত্য প্রসাদে
দেবতার এখন জগৎ বিস্তারের এই ক্ষণে এসেছে
সব নিবেদনের ভক্তির প্রবাহ হয়ে প্রসারিত জীবনময়।
যেমন করে হয়েছে ঐ মহাসত্যের দীপ্তি ভাস্বর
তেমনই হয়েছে বিকাশে ভাস্বর নিত্য মানব প্রদীপ।।

**আদি মানব বিকাশ ঃ**

যেভ্যো হোত্রাং প্রথমাম্ আয়জে মনুঃ
সমিদ্ধ অগ্নি! মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যৎ শতঃ।
সঃ উগাঃ নঃ করতঃ সুপথা স্বস্তয়েঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৭)

মানব মনের গগনে হয়েছে উদয় যে প্রেরণা।
হয়েছে সত্যের নিত্য উদয় পথের এই নিত্য দিশায়।
হয়েছে তোমারই সত্যের একেক পর্বের বিকাশ।
জগতের তরে যে অসংখ্য ভাবপ্রদীপ করেছ চয়ন।
এখন সে সব ভাবতনুর নিত্য উন্মোচনের এই ক্ষণ মাঝে।
হোক তোমারই সব ইচ্ছার পূরণ তোমারই সৃষ্টির পথে।
দাও ঐ বিকাশ মাধুর্যের দান এই জীবনের সাধন পর্বে।
হোক তোমার তুমি আনন্দ-প্রকাশী এই জীবনের পর্বে পর্বে।

**ভাগবতী চেতন ঃ**

যঃ ইহ হরি ভুবনক্ষ্য প্রচেতসো।
বিশ্বস্য স্থাতুঃ জগতাং জগৎ চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতান্ অকৃত্বাৎ এনঃ স্পবরী।
অদ্যাঃ দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৮)

ভাগবতী প্রজ্ঞায় ভাস্বর যে সৃষ্টির প্রবাহ
হয়েছে অন্তরে প্রদীপ্ত ঐ প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দীপশিখা।
এখন জগৎ মাঝে জ্ঞান বিস্তারের এই ক্ষণপ্রভায়।
তোমারই নিত্য ভাবে স্বতঃ উন্মোচনের এই ক্ষণে।
এখন আসুক তোমার ভাবস্পর্শ এসেছে সাধক জীবনে।
দাও তোমার ঐ অনন্ত কৃপার বারি করে উন্মোচন।
যেমন করেই তোমার ইচ্ছার প্রদীপ হয়েছে ভাস্বর।
এসেছে জীবন পথের একান্ত প্রকাশ ক্ষণের দীপ্তি উন্মোচানে।

দিব্য ভাবনার সূচনা যখন সত্যি সত্যি হয় তখন সাধক বা ভক্তের জীবনের গড়নেও নাড়া পড়ে যায়। যে পরিকাঠামো শরীরের বাইরের সেটিরও পরিবর্তন ঘটে যায় অল্প মাত্রায়। পরিবর্তন বা রূপান্তর মূলত ঘটে যায় অন্তর মাঝে। হৃদয়-মন-প্রাণ তখন অন্য রঙে রাঙিয়ে ওঠে। ভগবান যত সময় বাইরের তত সময়ে কিছুই হয় না। যখন তিনি হন সত্যিকারের অন্তরের তখন অন্যরকম হয়ে যায়। শ্রীরাধিকার গোপীদের প্রতি কথা রয়েছে এ বিষয়ে। তিনি বলেছেন ঃ "তোদের শ্যাম কথার কথা; আমার শ্যাম অন্তরের ব্যাথা।" ভগবান যখন সত্যিকারে হৃদয়ের বিষয় হয়ে ওঠেন তখন সব ওলট পালট হয়ে যায় অন্তর প্রদেশে।

হৃদয়ের বিষয়াদিকে অধিকার করে থাকে জগৎ প্রপঞ্চ। যা কিছু বিষয়, যা কিছু সম্পর্কের টান সবই অন্তরের আকাশ-পাতাল ব্যাপ্ত হয়ে থকে। জীবনের পথচলায় যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় সমীপে আসে সবই তার প্রভাবও বড় মাত্রার। জগতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলবার সময়ই ফুটে ওঠে জাগতিক সম্পর্কগুলির পরিমাপ ও পরিণতি। একেক সময়ে মনের মাঝে এমন সব ভাবনা ফুটে উঠবে যে জগতের সম্পর্ক স্থায়ী ও মঙ্গলজনক। যিনি ভগবানের পথে রয়েছেন, এক সময়ে বুঝতে পারবেন যে জীবরে এই চলার পথে যে যত কাছের বা আপনজন বলেই চিন্তিত হয়েছেন আকর, কালের প্রবাহে বোঝা যাবে সেটি সত্য ছিল একটি ক্ষুদ্র আংশিক মাত্রায়; আর তার মিথ্যার ভারটিই বেশি। এমনই সত্য-মিথ্যায় মোড়া রয়েছে জীবনের পথচলার আবরণটি। এমন করে মেশানো সব সত্য-মিথ্যার জীবন পরিবেশের মধ্যেই ভগবান হাত ধরে এগিয়ে যাবেন তাঁর শরণাগত প্রাণকে।

Neurotransmithers are of two kinds. They stimulate or they calm. They relay signals between nerve cells (neurons). The brain uses the neurotransmitters to trigger hormones to tell your heart to beat, your lungs to breathe, and your stomach to digest. They can also affect mood. Sleep, concentraton, weight, and can cause adverse symptoms when they are out of balance. Neurotransmitter levels can be depleted in many ways. Stress, poor diet, neurotoxins, genetic predisposition, drugs (prescription and recreational), including alcohol, nicotine and caffeine usage can cause these levels to be out of optimal range. It is estimated that 86 percent of Americans have suboptical neurotransmitter levels.

The main neurotransmitters are :

Dopamine; Serotonin; oxytocins; Noradrenalin.

The main hormones are :

Cortisol; Adrenalin; Testosterone; Estrogenl Progesterone.

(Tara Swart; Kitty Chisholm, Paul Brown; Neuroscience for Leadership, Palgrave Macmillan, 2015, UK, p. 5.)

ভগবানে মতি যদি হয় একটু মাত্রায়, কোনও কারণবশতঃ। সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়ে যায় আরও বেশি করে ভগবৎ অনুরাগী হয়ে উঠতে। একটু খানি ভগবত্তায় নিষ্ঠা আর একটুখানি ভালবাসার সঞ্চয়ে যে পুঁজি জমা হতে পারে তার শক্তি বিশাল। যে ভাবপ্রদীপ জীবনের এই চলার পথের পাথেয় হয়ে পথ দেখাতে চায় তারই আবার ক্ষণ এসে যায় যখন ঐ পথচলার গতিমুখ হয় নিশ্চিত ভগবত্তা।

জীবের অবয়বেই সাড়া পড়ে। ভগবানের নাম যখন অন্তরের গভীরে নিয়ে আসে স্পর্শ তখন ঐ স্পর্শের ভীষণ তীব্রতা সমগ্র অবয়বকে যেন আলিঙ্গণ করে ফেলে। ভগবানের প্রতি ভালবাসা যদি প্রস্তুত হয় তবে নানা অভিব্যক্তি একেক করে জীবনকে বরণ করে নেয়। এমন করেই হয়ে যায় একাত্মতার সূচনা। এই একাত্মতার সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে এক দিব্য ভাবদীপ্ত জীবন। একটি জীবনের মাঝে হয় দিব ভাব সঞ্চার ক্রমে সঞ্চারিত। এই সঞ্চারণটি পর্বে পর্বে হয়ে ওঠে জীবনের সব বাধা অতিক্রমী এক চেতনার প্রকাশ।

শিহরণটি যখন এসে যায় জীবনের মাঝে, ভক্তি সূচনার দীপ্তি জেগে ওঠে। ভক্তির এই সূচনা পর্বটিতে শিহরণের মধ্য দিয়ে ভগবৎ ভাব ও ভাবনা সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। জীবনের মাঝে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যেতে পারে এক দেববার্তার স্পন্দনে শিহরণের মাধ্যমে। জীবনব্যাপ্ত এই শিহরণ হয়ে ওঠে যদি স্বতঃস্ফূর্ত তখন সাধকের জীবন মাঝে ভগবৎ নাম-গুণগান-বার্তা-দিব্য স্পন্দন - ভগবৎ বিষয় - শ্রবণ-মনন নিয়ে আসে এমন অনুভূতির প্রবাহ যা কিছু রয়েছে জীবনের স্থিতি সর্বত্র ছড়িয় যায়। এমন করেই বিস্তৃত হয় ভাগবতী ভাবস্পন্দন সদাই জীবনের সর্বত্র তার পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। স্পন্দনের যে পরিচয় পাওয়া যায় ভাগবতী স্বতঃই ফুটে ওঠে। এমনও হয়ে যায় অবস্থা যে জীবন হয়ে যায় স্বতঃই সমাধি আশ্রয়ী। এই ভাব পরিচয়টি একাগ্রতা আর নিরুদ্ধ মনের পরিবেশে জীবনের দীপ্তি ফুটে ওঠে জগৎময়।

**অহং এর গণ্ডী পেরিয়ে দেবমার্গে ঃ**

ভরৈ এষ এব ইন্দ্রং সুহবং হত্বামহে।
অহং এবং উচ সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে।

ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/৯)
যখনই এসেছে সাধন পথে অদিব্য শক্তির বাধা
হয়েছে সাধন মন নিয়োজিত ভগবানের এই প্রকাশে।
যা কিছু ছিল ঘাটতি বিশ্বাসের এই একান্ত প্রবাহে।
এখন হয়েছে পূরণ দেবতার ইচ্ছা প্রদীপ ভাস্বরে।
দেবতার নানা রূপ প্রকাশ হয়েছে যখন বিভাসিত
যখনই হয়েছে ধ্যানের গভীরে একান্ত নিবিড় নিয়োজন
এসেছে তখনই জীবনের মাঝে তোমারই গভীর পরশ
দিয়েছ হৃদয় মাঝে ঐ দেবছন্দের এগিয়ে চলার শক্তি।

**বিশ্বমাতার কৃপার তরণী ঃ**

সুত্রাম নেং পৃথিবীং দ্যৌমন ইহ অসং।
সুশমর্নং অদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং সরিত্রাম্ অনাগসম্।
অস্রবন্ অতীমা রুহেমা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১০)
বিশ্বমাঝে এসেছে বিশ্বমাতার কৃপাপ্রসাদ স্বতঃই।
যেমনে হয়েছে ভাবনার দীপ্তি হয়েছে গতিময় এ ভাবনা।
এমন করে স্বতঃই হয়েছে দেবকৃপায় নিত্য উন্মোচন।
তোমারই চেতনের এই সীমার মাঝে এসেছে সদা আবর্তন।
জগতের কর্মপথের হয়েছে যে ভাবসম্পদ সঞ্চিত
এখন আসুক সময় ঐ সম্পদের ক্রম উন্মোচনের আরোহণে।
যে ভাবপ্রদীপ এসেছে জীবনের কাছে হয়ে স্থিত দৃঢ়
এখনও রয়েছে যত অন্তরায় সাধন পথে হবে তার নাশ এ ধ্যানে।।

**ধ্যান মার্গে দিব্যানন্দে ঃ**

বিশ্বে যজত্রা অধি বোচত উতয়ে।
ত্রায়ধ্বং নো দুরেবায়া অভিহুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহত্যা হুবেম্।
শৃন্বতো বো অবসো স্বস্তয়ো।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১১)
এই জীবন যজ্ঞের এখন হয়েছে পূর্ণতার পথে অভিযান।
যে ভাবপথ হয়েছে জীবনের দ্বারপ্রান্তের সদা সঞ্জীবন।
এখন বিশ্ব পথের এই জীবন প্রবাহে করেছি বরণ দেবতায়।
জীবন মাঝে হয়ে নিত্য স্থিত সদাই তোমার প্রকাশ পর্বে।
যেমন করে হয়েছে ভাবপথে আবাহন সদা প্রসারণ তরে।
এখনই হয়েছে নিত্য শুদ্ধির একেক পর্বের দেব আবাহন।
এই বিশ্ব পথের মন্ত্রধ্বনি জীবন মার্গে হয়েছে মূর্ত।
এখন দেবপ্রসাদের এই দিব্যানন্দের পরস্পর এসেছে ধ্যান মার্গে।।

**জগৎ কল্যাণব্রতে হয়ে ব্যাপ্ত ঃ**

অপো অমীবামপ বিশ্বমনঃ আহুতম্।
অপারঃ অতীম দুর্বিদৎ অহম্ অঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেযো অস্মাৎ ইহ এতম।
উরুঃ ন শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১২)
দেবতার দান এসেছে জীবনের এই নিত্য পথে এগিয়ে চলায়।
এখন তোমার ঐ দেবস্পর্শের দীপ্তি হবে উদার উন্মোচন।

যে প্রাণের প্রদীপ করেছে আলোর প্রকাশ জীবনের স্তরে।
হয়েছে তার নিত্য ভাস্বর ভাবপ্রদীপ জীবনের এই জাগরণে।
এই ভাবপ্রবাহের পরশ এসেছে জীবনের গভীর প্রদেশে।
আসুক ভাবপ্রবাহ নবীন চেতনের নবীন প্রকাশ মাধুর্যে।
হোক প্রসার জগৎ মাঝে সুখ প্রভার আরও মঙ্গল ব্যাপ্তি।
প্রশান্তির পরশে স্বতঃই এসেছে জীবনে ব্যাপ্ত এই কল্যাণব্রত।।

অঙ্গাদির মধ্যে একটি নতুন ধরনের সমন্বয়ের সূচনা হয়। এই নতুন ধরনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে জীবনের মাঝে এক নবীন সমীকরণ। এর ফলে হয়ে যায় এক নবীন মাপের জীবনযাত্রা। এই জীবন যাত্রা স্বতঃই হয়ে যায় যেন নবীন এক জীবনের সূচনা। এই সূচনা জীবনের চরিত্র ব্যবহার বিধি সবই হয়ে ওঠে যেন নবীন মাত্রার। জীবের চরিত্র বদলটি যে ভাবপথে ঘটে সেটির পরিণতি সপ্ত ধাতুর মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যায়। সপ্ত ধাতু হয়ে উঠবে নতুন ধরনের গড়ন এনে দেয়। রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-স্বেদ-রেত-স্নায়ু, সমন্বিত যে ধাতু মণ্ডল তার গুণগত রূপান্তর ঘটে যায়। ভাব সমন্বয়ে যেন সপ্ত ধাতুর সবকটি ধাতুই নিজেদের পরিবর্তিত করে ভগবৎভাবকে বরণ করে নয়জীবন মাঝে। এমন করেই জীবনের মূর্ত হয়ে যায় ঐ দিব্যভাব। ভাব বিস্তার করেই চলেছে এই স্নায়ুর মধ্য দিয়ে। এই বিষয়াদি হয়ে ওঠে জীবনের নিত্য প্রকাশবান। স্নায়ু এইসব ধানু মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় জীবন পথে। রক্তের বৈশিষ্ট্য স্নায়ু সঞ্চারণে যেন পাল্টে যায়। মজ্জার অভ্যন্তরে যেন প্রবেশ করে যায় ঐ দিব্য ভাব-বিকাশ। দিব্য ভাবের এই বৈশিষ্ট একদিকে জীবনের সব অঙ্গকে একাত্ম করে নিয়েই প্রকট করে দেয়। ভাবদীপ্তি যখন রক্ত-মজ্জা ইত্যাদি সব ধাতুর উপাদানের মধ্যে প্রবেশ করে, এর ভিতর রূপান্তরের শুরু হয়ে যায়। ক্রমেই এই রূপান্তরের ভাব স্বতঃই সমগ্র হয়ে যায়।

Produced by the hypothalamus and stored and secreted by the posterior pituitory glands, oxytocin acts primarily as a neuro modulator in the brain and is known as bonding hormones. In an experiment where men were asked to rate pictures of 100 women non attractiveness, they rated them as more attractive after one nasal spray of oxytocin with pictures being presented for a second time in a different order to the first time. So oxytocin underpins trust and bonding behaviour in real life and in simulated tastes by inducing a calm, warm mood that increases tender feelings and attachment and may lead us to lower our guard.

One chemical underlying trust is the neuropeptide oxytocin. Oxytocin levels rise significally during child birth and breast feeding. It is implicated in bonding betwen mothers and infonts in mammals.

Tara Swart, Kitty Chisholm and Paul Brown; Neuroscience for Leadership, Palgrave, Macmillan, 2015, p. 15.)

সাধকের অন্তর মাঝে ঘটে যায় এক মহাবিপ্লব। নিঃশব্দ, অপ্রকাশের বিপ্লব এটি। দেবভাব, ভগবত্তার স্পন্দন যখন জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে যায় স্নায়ু সঞ্চালনে সব জ্ঞানেন্দ্রিয়, সব কর্মেন্দ্রিয় আর চেতনেন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মৌলিক রূপান্তর ঘটে যায়। মনের তখন অবস্থা হয় বিগলিত ভাবের। যেন মনটি ক্রমে ভাবগহ্বরে প্রবেশ করে এক নতুন মনের সৃষ্টি করে। এই নতুন মনটি অন্যরকম। এই মনের মাঝে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব হয় না। বরং এই মনটি সব সময়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে দেওয়ার জন্য। যা কিছু সম্ভব তাই দিয়ে দেওয়ার হিসাব প্রস্তুত করে এই মন। এই মনটি খুঁজে ফেরে আর কি রয়েছে দেওয়ার জন্য। নিজের স্বার্থ পূরণের পর যদি কিছু থাকে পড়ে তবে সেখান থেকেই দিয়ে দেবার বাসনা ঘিরে ফেলে এই মনের মাঝে। এই মনই হয় বিকশিত ফুলে-ফলের বিশেষত্বে। এই মনের মাঝে গড়ে ওঠে নবীন সৃষ্টির মাঝে বিলিয়ে দেওয়া। জীবনের স্বাতন্ত্রের এই ক্ষণের বলম্বনে হয়ে যায় বিশ্বাস-দৃঢ় মনটি।

নবীন এ প্রেরণার ঢেউ এসে যায় নবীন এই জীবনের মাঝে। এ মনই স্বাতন্ত্রের হাতছানি আসে। ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার মন পেয়ে যায় ভাগবতী কৃপার বৃষ্টি। এমনই সে বৃষ্টির দাপট যে প্রাক্তনের যদি কোন মালিন্য ছিল অবশিষ্ট জীবনের মাঝে কৃপার এই প্রবাহে সে হয়ে যায় পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ তনু। শরীর বিশুদ্ধতায় যেমন করে বৃত হয়ে যায়, এই মনের নবীন মাত্রায় তেমন করে সৃষ্টি হয় সত্যময় একটি মন-প্রাণ-হৃদয়ের মিলন তনু। এটিই ভক্তির পটভূমি তৈরী করে দেয়। ভগবানকে বরণ করে নেওয়া এই মন স্বতঃই হয়ে ওঠে এক দিব্য আকাঙ্ক্ষী মন। এমন করেই হয়ে উঠবে অন্য মাত্রাই এক সাধক-ভক্তজীবনের অধিকারী। জীবনের দেবছন্দ এখন মহতী এই মনই সমাজের সর্বভাবে দেবভাব সমৃদ্ধ হয়ে জীবের সার্বিক পরিচয়কে বৃত করতে হবে তৎপর। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্রহ্মলাভ।

**ধর্মের বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা ঃ** অরিস্টঃ সঃ মর্তোঃ বিশ্ব এধতে
প্র প্রজাভিঃ জায়তে ধর্মন এস্পরি।

যম্ আদিত্য অসৌ নয়য়া সুনীত্তিভিঃ।
অতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে ১০/৬৩/১৩)
যা কিছু ছিল মালিন্যের উৎস করেছি চিহ্নিত সে সব।
হয়েছে যা কিছু জগৎ কর্ম করেছি সংগ্রহ অজানায়।
অনেক মালিন্যের সম্পদ হয়েছে সঞ্চিত জগতের ক্রিয়াপথে।
আবার হয়েছে বিশুদ্ধ কর্মপথের নিত্য প্রবাহ জীবনের উত্তরণে।
দেবতার আহ্বান এসেছে যদি জীবন মাঝে হয়েছে সময়
মালিন্যের পাহাড় হয়ে বিগলিত ক্রম উত্তরণের মার্গ প্রবাহে।
এখন আসুক ধর্মের বাতাবরণ জীবনের বিশেষ জাগরণে
হয়ে মালিন্য মুক্ত হোক জীবনের প্রকাশ সত্য-ঋতের ভূমিতে।

**দেবমাতার মাতৃশক্তির উদার বরণে ঃ**

যং দেবাসো অবথ বাজসাথো।
যং সুরমাতা মরুতৌ হিতে ধনে।
প্রাতঃ যাবানং রথম্ ইন্দ্রং সানসিম্।
অরিণ্য অন্তম্ আ রুহেমা স্বস্তয়ে।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১৪)
ঐ রথই ঈশ্বর যান হয়ে এসেছে জীবনের কাছে।
জগৎ মাতার কৃপাশক্তি দিয়েছে সম্ভাবনার আলোক প্রদীপ।
এখন যা কিছু এই অন্ধকারের আবরণ করে ভেদ এসেছে জীবনে।
হয়েছে তারই নিত্য দিনের প্রজ্ঞার ছন্দে হয়ে ভাস্বর জগতে।
ঐ রথের গতি হয়েছে সত্যের রথরশির সংযোগে
হয়েছে যাত্রা ঋত পথের উদ্বোধন পর্বে দেবমার্গে।
বিজরা নদীর ওপারে এসেছে সালজ্য বৃক্ষের শীতল ঠাঁই।
যে করেছে নিবেদন জীবনের এই পর্ব মাঝে ভগবানে তারই উত্তরণ।।

ব্রহ্মভাবযুক্ত মন-প্রাণ-হৃদয় যেন ডুবে রয়েছে। ব্রহ্মভাবে ডুবে গিয়েই যেন ডুবে রয়েছে। ব্রহ্মভাবে ডুবে গিয়েই যেন এক সমাধির অবস্থায় তার বিচরণ। চলমান সমাধি এটি। চলমান সমাধিতে সাধক স্বয়ং ব্রহ্মভাবে ডুবে থাকেন অন্তরের মাঝে। অথচ বাইরে, জগতের যা কিছু কাজকর্ম রয়েছে তার মধ্যেও সহজভাবে যুক্ত হতে পারে। শুধুমাত্র যুক্ত হওয়া নয়, সাধক এখন জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে কার সমস্যা সমাধানে কার্যকরী হতেও পারে। জগৎ কর্মের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদন যে ধরনের মনোযোগ ও শক্তির যোগান হয় প্রয়োজন তার সবই আসে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ব্রহ্মভাবে নিমজ্জন আর একই সঙ্গে জগৎ কর্মে ডুবে থাকা এ সবই গড়ে ওঠে। সত্যস্নাত একত্বের বোধ থেকে। চলমান সমাধি এতটাই গভীরে প্রভাবিত করতে পারে যে সাধকের সপ্ত ধাতুর আত্যন্তিক রূপান্তর ঘটে গিয়ে তার এখন পরিপূর্ণ একত্বের বোধে কর্মপ্রবাহ ঘটে যায়। এর মূল যেন প্রবেশ করে যায় সাধকের অন্তর মাঝে রয়েছে ভগবৎ ভাব চরিত্রে ভগবৎভাব, অথচ অনায়াসেই কর্মজগতের কর্মদীপ্তি শুধুমাত্র ফুটে ওঠে তাই নয়, এখন এই ভাবমণ্ডল থেকেই সকল জাগতিক ও পারমার্থিক ভাবদীপ্তি উত্থিত বা জাগ্রত হয়ে যায়।

দিব্যভাব সঞ্চাররটি সাধন প্রয়াস এর সঙ্গে জীবন ও জগতকে যুক্ত করে দেয়। এর ফলে যোগক্ষেম উভয়ই সাধকের অধীকারে চলে আসে। কর্মজগৎ জ্ঞান জগতে সাধক এখন আরও গভীরে বিচরণ করবেন।

দিব্যভাব সঞ্চার জীবনের মাঝে স্বতঃই ফুটিয়ে তোলে দিব্য শূন্যসমূহ। এই সাধন জীবন এখন শুধুমাত্র ভগবানে নিবেদিত হয়েও একজন শ্রেষ্ঠ জগৎ কর্মী। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিধি হয়ে যায় সঙ্কুচিত, পরিনামে শূন্য। ভগবানকে বরণ করে তার মধ্যে আনন্দের স্নান হয়ে যায় সাধকের জীবনের মাঝে। দিব্যভাব অবলম্বন করে সাধক হয়েছে সত্য অর্জনে। সত্যকে শুধুই একমাত্র জগৎ মাঝে কর্ম সম্পাদন নয়, একটি নবীন স্পন্দন এখানে গড়ে উঠবে। ব্রহ্ম সত্য অর্জন করেই হয়ে উঠবে ব্রহ্মময় চেতন। এই ব্রহ্মচেতনই নবীন সভ্যতার স্রষ্টা। ব্রহ্মের ভাব লাভ হয়েছে স্বতঃই জগৎ কর্মই হয়ে উঠে জীবনের অত্যন্ত আপন আর একমাত্র কল্যাণকারী জগৎচেতন ভাব।

—ঃঃ—

# অভিমান খুব খারাপ জিনিস, মা

## মনোজ বাগ

অভিমানই অন্তরায়। অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অন্তরায় এই অভিমান-ই। শুধু কী অধ্যাত্ম সাধন। জীবন জুড়ে যত রকমের সাধনা আছে, সমস্ত রকম সাধনার অন্তরায় অভিমান।

জীবনের সার্থকতা তার বিকাশে। বিকাশের পূর্ণতা তার অন্তর ও বাহিরের ব্যাপ্তিতে। অভিমান এই ব্যাপ্তিকে ব্যাহত করে। অভিমান ব্যাক্তির চারপাশের দেওয়াল হয়ে, ব্যক্তিকেই ঐ দেওয়ালে ঘেরাও করে রাখে। দেওয়ালে ঘেরা হয়ে ব্যক্তি দেওয়ালের বাহিরের জগত সম্পর্কে অন্ত হয়ে পড়ে। এই অজ্ঞতা অন্ধত্বের সমান। অভিমানের বহু ব্যাখ্যা আছে। দীর্ঘ ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায়, অভিমান বা Ego মনের একটি অবরুদ্ধ অবস্থা। অভিমান সর্বস্ব বা Egocentric জীবন, অবরুদ্ধ জীবন। Egoistic মানুষ ঐ অবরুদ্ধ অবস্থায় আচ্ছন্ন মানুষ। যে কোন অবরুদ্ধ অবস্থাই ব্যক্তিকে তার বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আত্মভিমানও তেমনি মানষকে প্রকৃত সত্য বুঝতে দেয় না, তাকে প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কতগুলো ধোয়া ধোয়া আবছা, অধরা সত্যকেই তখন ব্যক্তিকে চালিত করে। অথচ জীবনের উদ্দেশ্য যা যথাসত্য সেটি জানা। আভাসমাত্র জানায়, জানার সার্থকতা নেই। যথাসত্যই যে কোন বস্তুর বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানটি সামনে রেখেই চলে আমাদের জীবন ধারণ, জীবন যাপন। মানুষের ঈশ্বর অনুসন্ধানও এই বিজ্ঞানটি সামনে রেখেই।

তবু "আমার ভাবনাই আমার কাছে শেষ কথা"—নিজেতে আচ্ছন্ন থেকেই, নিজেকে ভালোবেসেই, মানুষ এরকম ধারণা নিজেতে পোষণ করে। সামান্য বুদ্ধির মানুষ সামান্য ভাবে করে, বিরাট বুদ্ধির মানুষ বিরাট ভাবে করে। চিন্তা-ভাবনার এই সংকীর্ণতা, অভিমান। অধ্যাত্ম সাধনার বা ঈশ্বর সাধনার শুরু এই অভিমানটিকেই নস্যাৎ করার চেষ্টা দিয়ে। এখানে "চেষ্টা" শব্দটি ব্যবহার করা হলো, কারণ যে অভ্যাস দীর্ঘদিনের, প্রজন্মের পর প্রজন্মের, তা এক মুহূর্তে নির্মূল হওয়ার নয়। জীব সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই আছে ব্যক্তিসত্তার প্রতিব্যক্তির একান্তের মায়া, মোহ। জীবনের বৃত্তিগুলি যে ক্ষুধা, তৃষ্ণাগুলিকে আশ্রয় করেই নিয়ন্ত্রিত হয়, এই মায়া-মোহেরও আশ্রয় সেই বৃত্তিগুলিই। ক্ষুধা অন্ন চায়, তৃষ্ণা চায় পানীয়। জীবন অন্ন-জল থেকেই তার বেঁচে থাকার রসদ পায়। এটাই জীবন। প্রাথমিক ভাবে এই বৃত্তিগুলিই আমাদের আত্মসচেতন করে। আবার এইবৃত্তিগুলিই আমাদের নিজেদের প্রতি মায়াচ্ছন্ন, মোহাবিষ্টও করে। অভিমানের মূল এই মায়া, মোহগুলিই।

এখানে সবাই বুঝতে চায়, সে এরকম বিশেষ কেউ, বিশেষ কিছু। অতি সূক্ষ্ম কীটেরও আছে এই বোধ, নিজের প্রতি এই আচ্ছন্নতা। নিজের—এই বোধ আশ্রয় করেই চলে জীবনের যা কিছু চলন, বলন। তাই আমি আসলে কী বা কতটা আমার সীমা, এই প্রশ্নকেও ছাপিয়ে ওঠে, জ্ঞান গরিমায়, প্রতিপত্তিতে আমি আর অন্যের চেয়েও কত বেশী প্রভুত্বশালী, জগতের কী কী আমার, জগৎটা কতটা আমার, এই ভাবনা। এই মোহের ঘোরেই চাঁদামাছও নিজেকে তুলনা করে চাঁদের সঙ্গে। বামনও চাঁদ ধরতে ছুটে যায়। শুনলে মনে হবে হাস্যকর। তবুও ঘোরের মধ্যে থাকলে এই হাস্যকর ক্রিয়াটিই সবাই জীবন বাজি রেখেও করতে চায়। এর বিরাট উদাহরণ স্বনামধন্য দ্বিগবিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার। ভাবনার মূল, সমগ্র জগতটাকেই নিজের করে পাওয়া। বিভিন্ন ভাবে "বীরভোগ্য বসুন্ধরা" ভাবটির তখন খুব রমরমা। বীরত্বের নামে লুটপাট—শক্তির মদমত্ততায়, অস্ত্রের জোড়ে এক শ্রেণীর মানুষের লোভ-লালসায়, সব কেড়েকুড়ে নিজের করে নেওয়ার উন্মাদনায় তখন ছারখার হয়ে যাচ্ছে আবিশ্বের নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা। এই ভাবনা নিয়েই তখন সারা বিশ্ব তছনছ করছেন তরুণ আলেকজাণ্ডার। এরপর একদিন এলো সেইদিনটিও, যেদিন যুদ্ধের ময়দানেই জগৎ। জয়ের উন্মদনাই তিরিশ বছরের বীর যুবকের কাছে নিয়ে এলো তার আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা। যা রাজসিক অভিমানের দৃষ্টান্ত। রাজসিক অভিমান তাঁর রাজ ঐশ্বর্যের কারণে, অভিমান তাঁর অজ্ঞানতা। কথিত আছে ভুলবশত আলেকজাণ্ডারের লোকজনেরা তাঁকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল, কারণ মরণাপন্ন অবস্থায়, শেষ সময়ে তিনি আর সে ভাবে সাড়া দিতে পারছিলেন না। জগতে বিভিন্ন সময়েই, বিভিন্ন নামের যত আলেকজাণ্ডার আজ পর্যন্ত আছেন, তাদের সবারই পরিণতি তাদের অকাল বিনাশেই সমাপ্ত হয়েছে।

জগতের সব লুটেরাকেই মহাকাল খালি হাতেই বিদেয় দিয়েছেন। তবুও কী নেশা গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটা চেটেপুটে আত্মসাৎ করে নেবার নেশা? যুগান্তর ঘটে গেছে তবু মানুষ দেখে শেখেনি, ঠেকেও শেখেনি। বারবার মরেও শেখেনি।

অভিমানের আরো অনেক দিক আছে। বিভিন্ন ভাবে মানুষের ভিতরে তা রাজ করে। সত্বঃ, রজঃ, তমঃ সব গুণ, সব ভাবেই অভিমান ঘুনের মতো বাসা বেঁধে থাকে মানুষের দেহে, মনে। পরিণামে পালক পিতাকেই ধোঁকা দিয়ে, তাকে ফোঁপড়া করে দেয়। প্রতিটি অবস্থাতেই অভিমান ব্যক্তি-মানুষকে প্রকৃত সত্য বুঝতে দেয় না। সর্পকে রশ্মি, রশ্মিকে সর্প বলে বিভ্রান্ত করায়।

আগেই বলা হয়েছে আলেকজাণ্ডারের জীবন রাজসিক অভিমানের দৃষ্টান্ত। তবে অভিমান সাত্বিকতার হলেও তা আমাদের আচ্ছন্নই করে। প্রকৃত সত্য, সময়ের আভাস ইত্যাদি যথাসময়ে বুঝিয়ে দেওয়া তো দূর অস্ত, যে কোন অভিমানই আগামীর ইঙ্গিত, অনাগতের আবভাব সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণাই দেয়। তবে অভিমানের সহজাত গুণ তামসিকতার। তাই আলোর ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্যের আলো সব কিছুতেই সে ঢেকে রাখে তার ছায়ায়, মায়ায়।

কথামৃতে আছে হনুমানজীর কথা। ভক্তশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র শক্তিশ্রীও। পরম শক্তিমান, ভক্তিবান, ভক্তিমান হনুমানজী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতামা-র ভক্ত। হনুমানজীর চোখে জগৎ ভগবান শ্রীরামময়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বলছেন, শ্রেষ্ঠ ভক্তিরও অভিমানের কথা—

শ্রীহনুমান স্বর্গে গেছেন। হনুমানকে দেখে শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে বললেন, তুমি এখনি সীতা সেজে বসো, ও স্বয়ং হনুমান, ও রাম-সীতা ছাড়া অন্য কিছু জানে না। এরপর ভগবান শ্রীনারায়ণ নিজেও শ্রীরাম সেজে হনুমানজীর কাছে এসে বসলেন। এ কাহিনী সাত্বিক অভিমানের উদাহরণ। তবে সর্বকালেই জগতের সব শ্রেণীরই সিংহভাগ মানুষই মিশ্র প্রকৃতির। মিশ্র প্রকৃতিতে দোলাচল থাকে। এক্ষেত্রে সত্ব-পজঃ, রজঃ-সত্ব একে অন্যতে মেশামেশি হয়ে থাকে। এর বিরাট দৃষ্টান্ত মহাভারতের ভীষ্ম। মিশ্র প্রকৃতিতে প্রদীপটা যেন নিভু নিভু অবস্থায় জ্বলে থাকে। নিবাত নিষ্কম্প শিখার উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণে অভিমান নেই। আছে আনন্দ। যে আনন্দ বেদনায় নীল। নীলকণ্ঠ শিবের কথা আমরা জানি, নীলাবয়ব শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটাই গরলে নীল। গরল ধারণ করেও শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিষ্মান তাঁর দিব্য আনন্দে। এ আনন্দ নিরভিমানের। ঘোর-আঙ্গীরসের এই শিষ্যটি একাধারে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, পরমজ্ঞানী, শক্তিবান যোদ্ধা, সুকৌশলী রাজনীতিবিদ, সঙ্গীতের মহাসাধক, সর্বোপরি সুদূরদর্শী আবার পরম বন্ধুবৎসল, প্রজাহিতৈষী, চিরপ্রেমিক মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণের আর সব গুণকে ছাপিয়ে যায় তাঁর প্রেমিক ভাব। প্রেম পরম আনন্দময়ের ব্যক্তিত্বের বিভা। এই আনন্দ অভিমানে ফোটে না।

এ জীবন একটা যাত্রা। যাত্রা সময়ের পথে। সময়ের যেমন পল অনুপল, তেমনি তার আছে প্রতিটি মুহূর্ত, পর্ব, অধ্যায়। সময়ের কোথাও থেমে থাকা নেই। জগতও কোথাও থেমে নেই। শুধুই রূপ থেকে রূপে তার রূপান্তর স্থান-কাল-পাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়েছে। সাধারণ চৈতন্যে এই রূপগুলিই স্থান কাল বিশেষে তাতে আপ্লুত হয়, তাতে হাসে কাঁদে, মুছড়ে ভাঙে, আবেগের তোড়ে ভেসে যায়। যে মানুষের দেহ, মন, প্রাণ আত্মাভিমানে জ'রে আছে তাদের এইসব হয়। যে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তের অভিমান জয় করে সদা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর ভিতর এ বিকার নেই।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে একই বৃক্ষের ডালে বসে থাকা দুটি পাখির চিত্রকল্পে এই ভাবনাটির ব্যাখ্যা আছে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া  
সমানাং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।  
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত—  
নশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি"।। (মণ্ডুক—ত-১-১)

(এরই রকম দেখতে দুটি পাখি একটি গাছের ডালে বসে আছে। যাদের একটি গাছের ফল ভক্ষণ করে ও ফল ভক্ষণজনিত কারণে তার ভাল মন্দের পরিণামেরও শিকার হয়। অপর পাখিটি এই সব ভাল মন্দের সঙ্গে কোন ভাবেই জড়ায় না।)

এই ভাল মন্দে না জড়ানো পাখিটি ব্যক্তির নিরভিমান সত্তা। জগতের সব রকম অবস্থায় মানসিক ভাবে জড়িয়ে সদা সুখী ও দুঃখী থাকা পাখিটি, ব্যক্তির অভিমানী সত্তা। প্রথম অবস্থাটি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা, অপর অবস্থাটি এই ব্যক্তিটিরই নৈর্ব্যক্তি সত্তা। সাধারণ অবস্থায় ব্যক্তি সত্তাটিরই প্রভাব, তার জগৎ-যাপনের সব রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই সাধারণ অবস্থার থেকে মানুষের উত্তরণ হলে যে কোন ব্যক্তিতেই ফুটে ওঠে তাঁরই অন্তরে অন্তরীণ তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। এই সত্তাটিই তাঁর অভিমান শূন্য অবস্থা।

প্রতিটি ব্যক্তিতেই আছে অর্জুন সত্তা। আবার প্রতিটি ব্যক্তিতেই আছে শ্রীকৃষ্ণ সত্তা। অর্জুন সত্তাটি আমাদের অভিমানী সত্তা, নিরভিমানী সত্তাটি শ্রীকৃষ্ণ সত্তা। নিরভিমানী সত্তাটির স্থান বা সময় বিশেষে কোন তরতম হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই নিরভিমান সত্তাটিকেই বলেছেন মিছরির রূপকে। তা যা শ্রীরামচন্দ্রে, তা-ই শ্রীকৃষ্ণে, আবার তা-ই শ্রীরামকৃষ্ণে। আজকের পৃথিবীর সাড়ে সাতশ কোটি মানুষের অন্তরেই অন্তরীণ আচে এই আস্ত একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা নিরভিমান সত্তা। যুগে যুগে যা জনসমাজে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বা শ্রীরামকৃষ্ণের নামের আধারে প্রচার পেয়েছে। এই নিরভিমান সত্তাটিই সমুদ্রের জলে গুলে যাওয়া একটি একটি নুনের পুতুলের অবস্থা। পরমাত্মার সাধনা এই গুলে যাওয়ার সাধনা।

এটি প্রতিটি মুহূর্তের সাধনা। এক মুহূর্তেরও বিরামের সুযোগ এখানে নেই। হাজার বছরের সাধনার ইতিও মুহূর্তের অসাবধানতায় ঘটে যাওয়া এখানে অস্বাভাবিক নয়। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে এনেছেন হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা। তবে আজকের দিনে হেড মাস্টারমশাই সবাই। কারোর অধিকার নেই দায় এড়াবার। তবুও কী দায় এড়াবার ফন্দি-ফিকির জগতে নেই? নিশ্চয়ই আছে। জীবনও ধারা। জগতে অজস্র জীবন, অজস্র জীবন ধারা। তবু একই পরম সত্যরূপ মহাসমুদ্রকে জালের মতো ছুঁয়ে আছে এই সব অগুনতি ধারা।

এরপরও একটি কথা আছে, দুটি ধারা আছে। এই ধারার কথাটি দিব্যত্মা শ্রী পবিত্র কুমার ঘোষ জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিজয় নাগকে লেখা একটি চিঠিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন। "দুটি ধারা আছে, একটি ধারা কম্প্রোমাইজ করেছে আর একটি ধারা কম্প্রোমাইজ করেনি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের যে ধারা এটি কম্প্রোমাইজ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে সুভাষচন্দ্রের ধারাটি কম্প্রোমাইজ করেনি"। (জয়শ্রী, পবিত্র কুমার ঘোষ স্মরণ সংখ্যা)।

পবিত্র কুমার কথাটি একটি বিশেষ প্রসঙ্গে বললেও এই ধারা দুটিরই আদি অন্ত বহু দূর বিস্তৃত। ব্যক্তি স্বার্থের সুবিধা অসুবিধা বুঝে চলা দোষের নয়। কিন্তু সেই স্বার্থ যদি বহু মানুষের স্বার্থের হানিকারক হয় বা বহু সংখ্যক মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয় তবে সভ্য সমাজে সেই স্বার্থটিকে বিচার করে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয় কাজ। তা না হলে অনাগত সময়কেই সময়ে সেই দায়টি নিতে হয়। প্রশ্নটি তখন ফিরে ফিরে আসেই। হিসেবের গড়মিলে অঙ্কের উত্তর ঝাপসা থাকলে তখন সময়ই কৈফিয়ৎ তলব করে। শাস্ত্র জ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তির রাজ আবেশ যখন কে মুহূর্তেই ছাইভস্ম হয়ে যায়। আমরা বহু স্বনামধন্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা এ প্রসঙ্গে পাবো। কিন্তু যথার্থ সমীক্ষায় ফিরে ফিরে আসবে সেই অভিমানের কথাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা—

রঘুপতি রাঘবের নামগান না করে গান্ধীজীর দিনই শুরু হোত না। স্বয়ং পুরুষত্তম এই রাজারাম ছিলেন নিরভিমানেরই পরমমূর্তি। গান্ধীজী রাম রাজার নিত্য পূজারি হয়েও সারা জীবন মান-অভিমানের দোলাচলই উপভোগ করে গেছেন। যা তাঁর ব্যক্তি মনকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তি অভিমান বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজকে বিভ্রান্তই করেছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ্যের শিষ্য দীর্ঘায়ু মহামতি ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে জীবনের অন্তিম সময়েও কৃষ্ণের লীলারহস্যের খেই পাননি। অর্জুন ভক্তির সমর্পণ দিয়ে যা পেয়েছেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁর অগাধ ধর্ম জ্ঞান দিয়েও তা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্নটি কারো পারা বা না পারা, বা বোঝা, না -বোঝা নিয়ে নয়। প্রশ্নটি যারা পারেন না তাঁরা কেন পারেন না? বা যারা পারেন তাঁরা কোন জাদু বিদ্যায় তা পারেন?

অন্তরে প্রাণের সাড়া থাকলেই যে কোন বস্তুই প্রাণী অর্থাৎ। একটি জীবন্ত সত্তা এবং যে কোন জীবন্ত সত্তার কাছেই সদাসর্বদা দুটি সত্য বর্তমান। একটি তার ব্যক্তি সত্য আর অন্যটি জগৎ সত্য। এই জগৎই মহাজগৎ। তার ব্যক্তি সত্যই তার ব্যক্তি সত্তা। ব্যক্তি সত্তার আছে স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা। এটিই তার প্রাণের জানান, নিজস্বতার ঘোষণা। ভাবটা যেন দেখো আমিও আছি। এটি তার ভিতরের উদ্ভাবনা ও বাহিরের উদ্যমের ইঙ্গিত। সে যে জগতে আছে তার প্রমাণ।

আমি কীট-পতঙ্গ হই বা মানুষ, আমার কাছে আমি মানেই সেটি একটি অজস্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমন্বিত চেতন সত্তা। যে চেতন সত্তাটির নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায়, আশপাশটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছা হয়। এটিই জীবনের বৃত্তি বা প্রবণতা। এই প্রবণতাগুলি নিয়েই জীবন। প্রতিটি জীবনই এই প্রবনতাগুলি নিয়েই জগতে টিকে থাকে। সাধারণ জীবন এই প্রবণতাগুলি নিয়েই নিজেকে জানে, বোঝে; এই প্রবণতাগুলির ভিতরে থেকেই জগৎ দেখে, জগৎকে জানে বোঝে। তারএই জানা, বোঝা, দেখাগুলিও ঈশ্বর দেখাই। তার এই নিত্যদিনের প্রতিটি মুহূর্তের জানা বোঝাগুলি ঈশ্বরকেই জানা বোঝা। সাধারণ জীব এই সত্যটি জানে না। বা জানতে চায় না। তার এই প্রতি মহূর্তের জানা-বোঝাগুলি, ঈশ্বর সত্যটি না জেনেই বা না বুঝেই বোঝার মতো। এটি একটি সদ্যজাত শিশুর অবোধ চোখে আশেপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পরিজনকে দেখা ও জানার মতো। এটি একটি সদ্যজাত শিশুর অবোধ চোখে আশেপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পরিজনকে দেখা ও জানার মতো। যেন সে একটা কিছু দেখছে বটে কিন্তু সে যে কী দেখছে তার কাছে তার দেখা বস্তু বা প্রাণীগুলির গুরুত্বই বা কী, সে তার কিছুই সেভাবে জানে না। তবুও ঐ সামান্য দেখা, সামান্য বোঝা পরিবেশটাই তার জগৎ। এই ছোট্ট জগতটাই শিশুর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে বড় হতে থাকে, আরো স্পষ্ট হতে থাকে। শিশুর অবোধ চোখের ওই দেখাই তখন খুঁজে ফেরে প্রকৃত বিজ্ঞান, ওই সমস্ত কিছুর অনুপুঙ্খতা (Details) ।

জীবের অধ্যাত্ম সাধনার বা অধ্যাত্ম জীবনের শুরু, তার ব্যক্তি সত্তাটির সামনে যে অপর সত্তাটি বিরাট আকারে আদিগন্ত জোড়া হয়ে পড়ে আছে, সেটি যে এক পরম সত্তা বা ঈশ্বর সত্তা, এই উপলব্ধি দিয়ে। আমাদের পারিপার্শ্ব জুড়ে যে জগৎ, যে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রতিনিত্যের ঘটনা, এই জগৎই এক পরম সত্যের প্রকাশ; এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ আসলে সেই পরমই-মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের শুরু যায়। এই সত্যের বোধ দিয়ে। যে মানুষের মধ্যে এই বোধ অন্য কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে,

সেই মানুষ লাখো ধার্মিকতায় নিমজ্জিত থাকলেও বা So called ধর্মকেন্দ্রিক সহস্র আচার আচরণের একনিষ্ঠ পালক হলেও, সেই মানুষের অধ্যাত্ম জীবন এখনো শুরুই হয়নি। অবশ্য যথাসময়ে কুয়াশার সরে যাওয়ার মতো এই আচ্ছন্নতাও সরে যায়।

তবুও যতক্ষণ এই আচ্ছন্নতা থাকে, সাধারণ অবস্থায় বা সাধারণ জীবন ধারায় আমরা একযোগে এই জগতেরই পরম অবস্থাটিকে দেখি না, তখন আমরা যা কিছু দেখি, সেই দেখায় আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বস্তুগত গঠন বা প্রকৃতিগত ধারণকেই দেখি। এটি বাহির থেকে দেখা। বাহ্য দেখা। তখন আমরা লতাটিকে দেখি লতা ভাবে, পাতাটিকে দেখি পাত ভাবে। তখন জীবকে দেখি জীব ভাবে, জড়কে দেখি জড় ভাবে। এরপর আসে গুণাগুণের বিচার— কোনটি আমার জন্য উপাদেয় বা কোনটি অনিষ্টকর তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের পরোখ। জীবের এই রোজের জানা-বোঝা-দেখা শোনাগুলোই এক মুহূর্তে বদলে যায় ঋষি জীবনে এসে। ঋষিও আর পাঁচটা ব্যক্তির মত, তিনিও দেখেন, তাঁরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। তবে তাঁর দেখাটি আর অন্য ব্যক্তিদের মতো নয়। ঋষি দেখেন যে বিরাট জগৎটি তাঁর সামনে রাখা আছে, এটি এর চেয়ে আলো অন্য ব্যক্তিদের মতো একটি জগতের কিছু অংশ মাত্র। এই ভাবনা থেকেই ঋষি উপলব্ধি করেন, তার প্রতিটি মুহূর্তের চোখে দেখা, কানে শোনা, মনে বোঝা জগতটিরই সব গতি প্রকৃতি ঐ আরো বিরাট জগতটিরই গতি প্রকৃতিরই অংশ। তিনি নিজেও ঐ জগতেরই একটি সামান্য অংশ। কৃষ্ণোযজুর্বেদীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয়র তৃতীয় ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনবাকে আছে এই পরমের কথা। পুত্র ভৃগুর প্রশ্নের উত্তরে এখানে মহর্ষি বরুণ বলছেন, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদব্রহ্মেতি”। অর্থাৎ যা থেকে সব কিছু জাত, যাঁর মধ্যেই জীবিত থেকেই বা জড় থেকেই সব কিছুর অসিত্ব বর্তমান থাকে, বিনাশ কালে যাঁর মধ্যেই ওই সমস্ত কিছুর লয় হয়, তাঁকে জানো, তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে জানতেও আমাদের উপায়—শরীর, প্রাণ, চোখ, কান, মন, বাক এই সব ইন্দ্রিয়াদিই। অর্থাৎ “অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোতং মনঃ বাচম ইতি”।

আমাদের জগৎ দেখাটি অকূল এক সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে ঐ সমুদ্রের স্বরূপ অবলোকন। যতটুকু দেখছি সমুদ্রকেই দেখছি। তবুও এই দেখাটিই সমগ্র সমুদ্র দেখা নয়। সাধারণ দেখায় আমরা ঐ সামান্য দেখাতেই ভরপুর হয়ে যাই। কিন্তু যিনি সমগ্র সমুদ্রের সত্য আন্দাজ করে ফেলেছেন তাঁর দেখার সাধ সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে ছ'মিনিটের ছ'টি ঢেউয়ের উথাল-পাতাল দেখেই মিটে যাওয়া কী করে সম্ভব। তাই চরৈবেতি, চরৈবেতির মহামন্ত্রের নিত্য উৎযাপনা। অর্থাৎ আরো গভীরে, আরো ব্যাপ্তিতে এগিয়ে এগিয়ে চলার তাড়না। এই এগিয়ে যাওয়াই জীবন, এই এগিয়ে যাওয়াই জগৎ। ত্রিভুবনে কোথাও এর বিরাম নেই। এই এগোনো সব নিজে নিজেই আত্মসাৎ করে নিজের দখলে নেবার জন্য নয়। এই চলা, ঈশ্বরের ব্যাপ্তি-গভীরতা উপলব্ধি করারই জন্য। যে গভীরে আছে আমার দেখা আপাত জগতেরই পরম অন্তর, যে ব্যাপ্তিতে আছে এই আপাত জগতেরই পরম বিস্তার। যা পরমেশ্বরেরই গভীরতা ও পরিব্যাপ্তি। জীবনের উদ্ভব এই পরমেরই অবাধ চৈতন্যেরই এক বিন্দু স্ফুরণ দিয়ে। জীব-চেতনা এই পরম চৈতন্যেরই বিন্দুবৎ প্রকাশ। বস্তুতে প্রাণের প্রকাশ হলে, বস্তুর অন্তর্গত এই চৈতন্যই সজাগ হয়। ঐ চৈতন্যের জীব, জগৎ দেখে, নিজেকে দেখে।

ব্রহ্ম নিজে এই বস্তু ও প্রাণেই একাকার হয়ে আছেন। যদিও জীববিজ্ঞানে প্রাণের উদ্ভবের বহু ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা যাই থাক, বাহ্যত আমরা জগতের যা কিছু দেখি তার সবটাই দৃশ্যত এই যুগল অবস্থাই।

এই যুগল অবস্থাই জগতের জীবাবস্থা বা জড়াবস্থা। বস্তুতে প্রাণের স্বকীয়তা প্রকট হলে, আমরা বাহ্যত দেখি এই যুগল অবস্থারই স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততা। এই স্বয়ংক্রিয়তাই জীবন। এর নিষ্ক্রিয় অবস্থাই জড়ত্ব। তাই সাধারণত বস্তুতে এই স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততটি নেই। জীবনের শুরুতেও এই স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততাটিও থাকে অস্পষ্ট অবস্থায়। জীবনের অগ্রগতি এই অস্পষ্টতাকেই ক্রমশ স্পষ্ট করে। জৈবিকতায় বা স্বক্রিয়তায়, সময়ে এই স্বতঃস্ফুর্ততাই যথাসত্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তির প্রতি আরো আগ্রহী হয়। এই স্বক্রিয়তাই বা স্বচলতাই ব্রহ্মের চৈতন্যাবস্থার বিশেষ গুণ।

তবে জড়ও নড়েচড়ে, চলে। বাতাস চলাচল করে। জলধারা বয়ে যায়। সমুদ্র উথাল পাতাল করে। ধুলো-বালি ওড়ে। ভারী কঠিন পাথরও ঢাল গেলে গড়িয়ে পড়ে। নিষ্প্রাণ যন্ত্রও পরিচালিত হলে ক্রিয়া করে। এই জড়ত্বও ব্রহ্মেরই বিশেষ গুণ। তবুও জীবের সঙ্গে জড়ের তফাৎ অনেক। মূল তফাৎ স্বাধীন ইচ্ছায়। জড় পর্বতপ্রমাণ হলেও তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। জীব কীটমাত্র হলেও তার স্বীধীন ইচ্ছা আছে। এই ইচ্ছাটি তার অন্তর অনুভূতি। জড় সমুদ্রপ্রমাণ হলেও তার এই নিজের বোধটি নেই। এই দুই অবস্থাই ব্রহ্মেরই অবস্থা।

এক অবস্থায় ব্রহ্ম যেন মৃত বা গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, আর এক অবস্থায় এই সর্বাতিশায়ী স্বয়ং ব্রহ্মই আত্ম চেতনায় আছেন ভরপুর হয়ে। আবার তাঁর সব চেতনা যে একই স্থানে, একই আধারেই নিহিত হয়ে আছে তাও নয়। স্বাদ বৈচিত্র্য সর্বত্রই যেমন আছে, জগতে বর্ণ বৈষম্যও তো আছে। আলাদা আলাদা করে ভাবলে, একই বৃক্ষেরই লতার সঙ্গে পাতার কত অমিল,

ডালের সঙ্গে কাণ্ডের, ফলের সঙ্গে ফুলের, ফুলের সঙ্গে মূলের কত গড়মিল। তবু প্রতিটি গড়ে ওঠাতেই আছে উপাদান ও উদ্যমের ভিন্ন ভিন্ন আনুপাতিক বন্টন। এই অনুপাত কোথাও এক নেই। এমনকি একই মায়ের গর্ভে জাত একই সময়ের দুটি জমজ ভাই বা বোন বা ভাই-বোনের মধ্যেও নেই। একই শিল্পীর আঁকা দুটি রেখাও কখনও এক হয় না।

খুব সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, এই বৈষম্য যন্ত্রও দূর করতে পারে না। জেরক্স কপিতেও বৈষম্য থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে উপাদানগত তরতম এবং তা ভাবগত ও বস্তুগত দুইয়েরই থাকে। এই তরতমই একটি পিঁপড়ের সঙ্গে একটি বিরাট বপুর ঐরাবতেরও তফাৎ করে দেয়। হয়তো একই শিল্পী একই মাটি দিয়েই গড়ছেন শিব মূর্তি ও বানর মূর্তি; এক্ষেত্রে মাটি ও শিল্পী স্বয়ং এক হলেও শিল্পীর শিল্প ভাবনার বিভিন্নতা আলাদা আলাদা সৃষ্টির ইন্ধন হয়। তা না হলে শিবঠাকুরের সঙ্গে বাঁদরের তফাৎ থাকবে না। কিন্তু কেন এমন হবে? আসল ঘটনাটি, এটাই হয়ে আসছে, হয়, এবং হবেও। কারণ এটাই নিয়ম। এই নিয়ম স্বয়ং ব্রহ্মেরই। যে নিয়মের বাইরে ব্রহ্ম নিজেও নন।

জীবনের, জগতের প্রতিটি গতি-প্রকৃতিই এই নিয়মেই নির্ধারিত। এই নিয়ম আছে অতি সূক্ষ্ম স্তরেও, এই নিয়ম আছে বিরাটেও। বিন্দুতেও আছে এই নিয়ম, বিভুতেও আছে এই নিয়ম। জীবের সারা জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মূলেও আছে এই নিয়ম। এই নিয়মই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছে। এই নিয়মেই পরিচালক নিজেও চলছেন। যেন যন্ত্র র যন্ত্রী একই নিয়মে নিবদ্ধ হয়ে আছে, শিল্পী রত্রা শিল্প, স্রষ্টা আর সৃষ্টি একই ভাবে বাঁধা হয়ে আছে। জগতটা একটা উৎপাদনশীল বিরাট যন্ত্রের মতোই। এর চালক থেকে শুরু করেঅতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ প্রতিটি পর্যায়েই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথ। এর যথাযথ অনুধাবনই যথার্থ জীবন। জীবন চলছে ঐ নিয়মেই। তবে নিজস্ব মন থাকায় জীবের নিজস্বতার অভিমান এই নিয়মের সঙ্গে সংঘাতে যায়। একই কর্নসাটে অজস্র যন্ত্রকে এক সুরে এক লয়ে বাজতে হলে চলনে বলনে কারোরই বেসুরা, বেতালা হলে চলে না। জড়ের পক্ষে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। জীবনে এই উল্লঙ্ঘনটি হয় নিজেতে নিজে আচ্ছন্ন থাকার কারণে। এই ঘোরটি কেটে যায় গভীর ভালোবাসা হলে। ভালোবাসা, প্রেম, কাঁচা অবস্থায় অভিমানী করে। কারণ তখন তুমি মানেই তোমার চোখ মুখ ধরণ গড়ন। তখন ব্যক্তি মানেই দেহ, মনের বৃত্তি, আচার আচরণ। বস্তু মানেই বস্তুর স্বাদ গন্ধ বর্ণ। এই প্রেমই পাকতে পাকতে সম্পূর্ণ পেকে গেলে তখন দেখার বোঝার অভিমানও গলে জলে জল হয়ে যায়। অভিমান সম্পূর্ণ গলে গেলেই নিরভিমান আপনা থেকেই জাগে। অভিমান থাকতে নিরভিমান জাগে না। সে অভিমান যারই হোক। নিরভিমানেই আসে চিত্তবৃত্তির পূর্ণ প্রশমন। পাতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

চিত্তবৃত্তির দাপট যেখানে যত বেশি সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতাও তত বেশি। তখন এক বিন্দু স্বার্থও সেকানে বিবেচ্য, ফেলনা নয়। আমি নমক সত্তাটিকে ক্ষুণ্ণ করে কিছু করা তখন মনে হয় অসম্ভবই। এই অসম্ভবকেও যে মানুষ সম্ভব করছেন তিনি ঋষি। তিনি অবয়বে মানুষ, মনে প্রাণে হৃদয়ে ঐ আধারটি ছাপানো আরে বিরাট সত্তা। আমরা বাইরে থেকে তাঁর মানুষ অবয়বটিকে দেখি। ভিতর থেকে ভাস্বর থাকে তাঁর অন্তরের কিরণ। এই কিরণ তাঁর পরম অবস্থ্য় আবেশ। যে অবস্থায় ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তি অভিমান গলে যাচ্ছে তঁর প্রতি মুহূর্তের দেখায় শোনায় বোঝায়। এ অবস্থায় তিনি যা দেখছেন, শুনছেন সবই সেই পূর্ণ পরমেরই পরমসত্তা। তিনিই তো আছেন তাঁর সবটুকু জুড়ে। ঋষিত্ব মানুষের ভিতরে এই দেখাটিকেই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তখন একই বস্তু শুধু দেখার গুণে সামান্য ব্যক্তির কাছেই অন্য বাবে প্রতিভাত হয়। আসলে তখন আর রজ্জুতে সর্প ভ্রম, সর্পে রজ্জু ভ্রম নেই। এই অবস্থারও আরো গভীরে ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়া আছে। জীবন এরকমই।

—ঃঃ—

# সাধকের সাধন পথই ভগবান লাভের সত্য পথ

## মানবেন্দ্র ঠাকুর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'আমি প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে সতত বিশ্রাম করি।' তাই সেই পরমব্রহ্ম সনাতনকে আমাদের হৃদয়ে ধরে রাখার মন্ত্র যতনে অর্জন করতে হবে। শৈশব কাল হতে সেই শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা সমাজের কল্যাণ ও সংরক্ষণ করতে পারে। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে ঃ যেমন সব জীবিত প্রাণী বাঁচবার জন্য বায়ুর ওপর নির্ভর করে তেমনই সমাজের অন্য স্তরের মানব তাদের জীবন ধারণের জন্য গৃহস্থদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এই কথার ওপর জোর দিয়ে বার বার বলেছেন ঃ "গৃহস্থরা সর্বদা মনে রাখবেন আদর্শ-কল্যাণ ভোগে নয় জ্ঞান লাভে, যা সম্ভব হয় সমন্ ব্যষ্টিজীবনকে সমষ্টি জীবনের বা বিশ্বজীবনের অংশ বলে বোধ হয়। ভক্ত গার্হস্থ্য কর্তব্যের মাধ্যমে ভগবদুপাসনা করে, বনে গিয়ে আধ্যাত্মিক নিয়মনিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করে চিত্ত শুদ্ধ করবেন।"

হিন্দুশাস্ত্র মতে গৃহস্থকে পাঁচ রকম কর্তব্য পালন করতে হবে; ১। দেবপুজা (দেবযজ্ঞ), ২) শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদপাঠ (ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ), ৩) সাথীদের বা অতিথিদের সেবা (নৃযজ্ঞ), ৪) পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করা (পিতৃযজ্ঞ) ও ৫) ইতর প্রাণীদের রক্ষা করা (ভুতযজ্ঞ)। এই কর্তব্যগুলিকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলে। এই সব কর্তব্যগুলি একঘেঁয়ে খাটুনিভাবে নয়। সেবাভাবে, পূজাভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এইভাবে কর্তব্য সম্পাদন জীবকে আবদ্ধ করে না, বরং অধ্যাত্ম-জীবনে উন্নতি লাভে সহায়তা করে। বেদান্ত কর্তব্য, সেব ও পূজাকে এক সূত্রে-গাঁথতে চেষ্টা করে। যদি কোন কর্মকে অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তবে তাকে কর্তব্য বল যায় না। যদি দেখো কোন কর্ম তোমাকে ঈশ্বরের থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তবে তা করবে না। সব কাজই যেন তোমাকে ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, কৃষ্ণ যেমন উদ্ধবকে বলেছিলেন ঃ "যে আমাকে সর্বদা এক নিষ্ঠভাবে পূজ করে কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে, আমাকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে, সে জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করে ও অচিরে আমাকে পায়। সব কর্তব্যই আমার প্রতি ভক্তি ভাবে করলে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। পরম শান্তির এই হলো পথ।"

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার কর্তব্যের ওপর প্রত্যেক মানবের নিজের প্রতি-স্বীয় উচ্চতর আত্মার প্রতি কর্তব্য আছে। যেহেতু প্রতিটি আত্মা-পরমাত্মারই অংশ-যখন মানব তার উচ্চতর আত্মার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করে, তার অন্যান্য সব দায়িত্বই পালন করা হয়। মানবের উচ্চতর আত্মা তার অভিব্যক্তির, প্রস্ফুটিত হবার অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি সদাই নিম্নতর আত্মা বা অহং এর দ্বারা আবৃত হয়ে যাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলে, ইন্দ্রিয়ভোগের অতিরিক্ত তাড়নায় মানুষ অন্তরের 'শান্ত নম্র ডাক', আত্মার ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে। ফলে যে বা কিছু করে তা শেষ পর্যন্ত তার কাছে, অশান্তির ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে পড়ে। এমনকি তার সাথীদের প্রতি কর্তব্য ও তাকে ক্লান্ত ও বিফল মনোরথ করে। আমাদের সব কর্তব্য কর্মেরই একক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত উচ্চতর আত্মার অভিব্যক্তি। তবেই জীবন অর্থবহ বলে মনে হবে। মূল সমস্যা হল মানুষ নিয়ন্ত্রিত সাধন পদ্ধতির ভিতর দিয়ে না গিয়েই—ঈশ্বরের হাতের পবিত্র যন্ত্র স্বরূপ না হয়েই —শিক্ষক হতে চায়। তিনি মানবের দেহ-মন্দিরে বাস করেন। আমরা প্রথমে নিজেরা তঁকে জানব, নিজেদের সমস্যার সমাধান করব, পরে অন্যকে সাহায্য করব। আমরা এইরূপ হয়েই অপরের অজ্ঞাতসারেই সত্যের প্রভাব বিস্তার করে তাদের সাহায্য করতে পারি। কিন্তু নিজেরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ না করে অন্যকে আধ্যাত্মিক পথে সহায়তার কথা চিন্তা করা বা একেবারেই অবাস্তব। একবার শুদ্ধ পবিত্রতা ও অনাসক্তি অর্জন করলে মানব আর সংসারে বদ্ধ হয় না আর সংসারও মানব-মন ও স্নায়ুর ওপর কোন ক্রিয়া করতে পারে না। "ধ্যান ও আনন্দময় জীবন" থেকে গৃহীত।

ঋতস্য হি ধেনবো ব্যবশাল ঃ
স্মুধগ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ।
পরাবতঃ সুমিতং ভিক্ষমানা
বি সিন্ধব সময়া সন্নুঃ অদ্রিম।।

তোমার অনুভবের স্রোত এসেছে এখানে
দেব জগৎ থেকে হয়ে প্রবাহিত বিপুল বেগে
এ জগতের মাঝে বয়ে নিয়ে অনুভবে দেবসত্য
জগতের মানবের পরম উত্থান প্রকাশত চরে
স্বতঃই আহরণের এ সত্য আকাঙ্ক্ষীর জন্য
যেমন গোমাতার রয়েছে গোদুগ্ধ অবারিতে বৎসে।
তোমার এই সত্য ধারা চলেছে এখন জীবন প্রবাহে
চলেছি ঐ সত্য বার্তা নিয়ে মাথার পরে সব বাধা পেরিয়ে।।

বাধার প্রাচীর পেরিয়ে জীবনের মসৃণ গতি জগতের পুর্ণতার জন্য। এখন এই পূর্ণতার অভিযান মানবের জীবন সীমার অধীনে। অথচ তার এগিয়ে চলা কৃপার পরশেই হয়েছে। জীবন এগিয়ে চলবে ঐ ক্রমাগত বিগতকে অতিক্রম করবার জন্য। যা কিছু হয়েছে বিগত কালে, এখন আর তারই জন্য ছুটে লাভ নেই। জীবন স্থিত হয়ে ভাগবতী সাধন পথকে উজ্জীবিত করতে পারে। বৃথা কালক্ষেপ সাধকের আজকের পর্ব পেরিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। জীবনের এখন এগিয়ে চলবার ক্ষণ। এখন সব প্রয়াসকে সংহত করে জীবনের সব কর্মকে সংহত করতে হয়। একমুখী করে তোলা সাধনের লক্ষ্যে। এই একমুখ হবার অর্থ সাধককে এক নবীন অনুভবের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। এই অনুভবের রাজ্যে এখন জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে ক্রম বিকাশের আর ক্রম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। তাই জীবনকে কিছু কিছু মাত্রায় ত্যাগী হয়ে উঠতে হয়। ভগবানের জন্য রচিত হয়েছে। হৃদয়ের আসনটিও অনুরূপ। হৃদয় জানবার ও বুঝবার জন্য সদা আগ্রহে ভরপুর হয়ে ওঠে। সত্য বার্তা প্রথমে চয়ন করতে হয় সাধন পথে। সত্য বার্তা অনুধাবন হলে তখনই সাধন পর্ব শুরু হয়ে থাকে। সত্য বার্তা হল ভগবানের বার্তা। সাধনের লক্ষ্য হল ভগবানকে জানা। জানবার এই উদ্যোগ প্রথমেই

সূচিত হয় তাঁর বার্তা দিয়ে। ভগবানের এই বার্তা জানা সাধন পর্বের সূচনা। সাধন পর্বের এই সূচনায় বার্তা আসে সাধকরে কাছে। সাধকের সাধন চেতনে বার্তা সত্যকে হন করে নিয়ে আসে। প্রথম পর্বে সত্যটি মিশ্রিত। ব্রহ্ম সত্য পাঠকের কাছে জাগতিক সত্যেরই একটি ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন রূপে ধরা দেয়।

ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষামানা
দিবি শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াস ঃ।
নক্তাঃ চ চক্রুঃ উষসা বিরূপে।
কৃষ্ণ চ বর্ণম অরুণং চ সংধুঃ।।
দেবতার তরে করতে অর্পণ সাধনে
মানব চেতনের সংহত সব রূপের
সত্য পথের সত্য প্রেরণা করে বরণ
জীবনের পথে চলতে দেব চেতন নিয়ে
তোমায় করতে নিবেদন সদাই সবদিকে
দেবসত্যের জ্ঞান উন্মোচনের প্রতীক্ষায় জগতে।
এখন এসেছে বার্তা রাত্রির অবসানে
তোমার প্রতীক্ষার অন্তে মিলেছে তোমার চেতন।।

সাধনার শুরু যে অগ্নি দেবতার অঙ্গনে, সেখানেই সূচনা হয় নিবেদনের। সাধনায় অর্জন ও নিবেদন পর্যায় ক্রমে হতে থাকে। অর্জন হতে থাকে সাধন পথে। সাধনার সাধন ফল। সাধকের সাধনার ধারা তার পথ দিয়েই চলতে থাকে। সাধনার সব বই অর্পণের আর সমর্পণের। ক্রমে ক্ষুদ্র পর্ব থেকে বৃহত্তর পর্বে। সাধনার পথটি সত্য পথ। সত্যের অভিমুখে চলে এগিয়ে সাধন। সত্য দর্মে তাকে বরণ করে নিয়ে আরও চলে গভীরে সত্যকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস। সত্যের উপলব্ধি বা সত্যের বোধ ক্রমে একমাত্রা থেকে এগিয়ে গিয়ে অন্য মাত্রায় চলে যায়। পলে একটি থেকে অন্যভাবে সত্যের স্বরূপ চিনে নেয়। সত্য ধ্রুব। অথচ সত্যের পরিচয় বিবিধ। একজনের কাছে একই সত্য এক এক রূপে ধরা পড়ে। এক একটি ভাবে সত্যকে ধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সাধন ধারা। জড় চেতনে ধরা দেয় জড় সত্যের বাহ্য পরিচয়। জড় সত্যের বাহ্য পরিচয়টি আপাত সত্য। জড় সত্য বপাহ্যত যখন দেখা হয়; জড় সত্যের স্বরূপটি ফুটে ওঠে। জড় সত্য পুরোপুরি উন্মোচন করতে হলে জড় পরিচয়ের গভীরে যে চেতন অংশ রয়েছে তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। জড়-বিজ্ঞানের সাধনা এই জড় সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য। জড় সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ চেতনের সহযোগ বিনা সম্ভব নয়। জড়ের উপর নিরীক্ষণ এবং জড় প্রকাশ একের পর এক পর্ব উন্মোচন করতে থাকে। জড়ে বাহ্য পরিচয় জানবার জন্য জড় বিজ্ঞান বহুভাবে অন্বয় চলেছে। বিজ্ঞানের জয় যাত্রাটি তখনই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তখন বাইরের পরিচয়ের সাথে সাথে। বেদবিজ্ঞানের গভীরে ঃ তত্ত্বে, প্রকাশে গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

জয়মাঃ—জয়মাঃ—জয়মাঃ

—ঃঃ—

# শ্রীগণেশ চতুর্থী

## সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

আকাশের বাঁকা চাঁদ জানে তোমার জন্ম কথা
জানে খণ্ড মেঘ নীলের গায়ে দীপ্ত নক্ষত্র
জানেন গিরিনন্দিনী মহেশ্বর তোমার সৃষ্টিকথা
আর কেনই বা তোমার এমন রূপ
ভাদ্রের মাঝামাঝি এই সময় দেশজুড়ে
তোমার আরাধনা তোমার আবাহন
ফুলপাতা ধূপ ধুনোয় আর নানান
দ্রব্যসামগ্রী সহ তোমার পূজা হে গজানন
তুমিই গণপতি তুমিই বিনায়ক ভক্তের শ্রীগণেশ
পূজা অনুষ্ঠানে পূজিত হও সর্বাগ্রে তুমিই
হে দেবতা সিদ্ধিদাতা তুমিই উচ্চারিত শুরুতেই
তুমিই গণনাথ তুমি জ্ঞান তুমিই বিজ্ঞান
সম্পদের দেবতা তুমি তুমিই পণ্ডিত
বিজ্ঞতা বিচক্ষণতার পাণ্ডিত্যের প্রতীক
তোমারই আশীর্বাদে সর্ব কর্ম শুরু হোক
পূর্ণতা পাক আমাদের অপূর্ণ অসম্পূর্ণ যত
কাজ—হে বিঘ্নহর দয়া করো কৃপা করো তুমি
সিদ্ধ দাও জীবনে চলার পথে সতত।

—ঃঃ—

# জপের-মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ

**স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়** Vedic Priest, শিলিগুড়ি

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিনে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্‌।
পাদপদ্মে তক্ষোঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুর্হু।।
ওঁ নমঃ শ্রী যতি রাজায় বিবেকানন্দ সুরথে।
সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপুত অগ্নিতে আহুতি দানকে বৈদিক যজ্ঞ বলা হতো। প্রাচীনকালে যজ্ঞই ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গ ছিল এবং এটি দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের নিত্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র দেবতার উদ্দেশ্যে কথাটিকে ব্যাপক করেছেন। মনু স্মৃতিতে বলা হয়েছে—

"ঋষি যজ্ঞং, দেব যজ্ঞং, ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং, পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি ন হাপয়েৎ।।"

গৃহস্থের পঞ্চ সুনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দূরীভূত হয়। 'সুনা'— অর্থাৎ বধস্থান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে —উদখল, জাঁতা, জলকুম্ভ, মাজ্জনী ও চুল্লি —এই পাঁচটি জীব হত্যার সম্ভাব্য স্থান। এই সকল পাপের নিবৃত্তির জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করণীয়। এগুলো হলো ঋষি যজ্ঞ-দেবযজ্ঞ-ভূতযজ্ঞ-নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ।

ঋষিযজ্ঞ— নিত্য বেদপাঠ, সন্ধ্যা উপাসনাদির নাম ব্রহ্মযজ্ঞ বা স্বাধ্যায় যজ্ঞ।
দেবযজ্ঞ— অগ্নিহোত্র বা গৃহদেবতার অর্চ্চনার নাম দেবযজ্ঞ।
ভূতযজ্ঞ— গো-মহিষ ইত্যাদি ইতর প্রাণীর সেবার নাম ভূতযজ্ঞ।
পিতৃযজ্ঞ— পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, তর্পণাদি করাকে বলা হয় পিতৃযজ্ঞ।

তাছাড়া বহু প্রকার যজ্ঞ আছে

দ্রব্যযজ্ঞ— আগুনে ঘি ও অন্যান্য দ্রব্য আহুতি দেওয়াকে বলে দ্রব্যযজ্ঞ।
তপোযজ্ঞ— তপস্যারূপ যজ্ঞকে বলে তপোযজ্ঞ যেমন পঞ্চতপা মা সারদা দেবী করেছিলেন।
প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ—অনেকে প্রাণায়াম করেন সেটাও এক প্রকার যজ্ঞ।
সংযম রূপ যজ্ঞ কেহ কেহ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।
নরমেধ যজ্ঞ— নরমেধ নামক যজ্ঞে নরবলির কথাও কিছু কিছু পুরাণে বর্ণিত হতেছে।
সর্পযজ্ঞ— জন্মজয়ের সর্প যজ্ঞ
কামনাযজ্ঞ— রাজা দ্রুপদের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বধের কামনায়, কামনামুলক যজ্ঞ ছিল।

— দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন— কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুনকে দেওয়া গীতা উপদেশ তিনি যজ্ঞ শব্দের মূল অর্ত দ্রব্যযজ্ঞকে লক্ষনা দ্বারা বিস্তৃত করে তপস্যা-ইন্দ্রিয় সংযম-মনহ সংযম -সমাধি-বেদপাই প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনকে এক যজ্ঞ শিরনামায় সমাবেশ করেছেন, ছোটো, বড়ো সকল কর্মই যজ্ঞ হতে পারে, যদি তা কামনা রহিত হয় এবং ঈশ্বর প্রীতার্থে করা হয়। এভাবে গীতা মানরে সমগ্র জীবনকে যজ্ঞময় করে তুলতে চেয়েছেন।

জপ হল মন্ত্রের সাহায্যে নিরাসক্তি, ইন্দ্রিয় দমন ও মনের ধৈর্য্য ধরে রাখার কর্মের অনুশীলন। মনকে যা ত্রাণ করে অর্থাৎ উদ্ধার করে তাকেই বলে মন্ত্র।।

গীতাতে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যজ্ঞ কথাটিকে আরও সম্প্রসারিত করে বলেছেন—

"যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি"

"মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ত্রো কম ক্ষরম
যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" (১০/২৫)

যজ্ঞ সমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। তার এই দিব্য উক্তিকে অনুসরণ করে ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎরা জপযজ্ঞ বা নাম সংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলে মেনে নিয়েছেন। ভক্তিমার্গে নাম রূপেরই সাধনা। সমগ্র জগত নাম-রূপাত্মক। নামযজ্ঞ নাম ও নামী অভেদ। আধুনিককালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই নামযজ্ঞের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন।

এই জপই হচ্ছে মানুষের জীবন থেকে মহাজীবনের যাত্রাপথের একমাত্র মুখ্য কাণ্ডারী। কারণ এই একমাত্র জপের সাহায্যেই মানুষের মন দ্রুত ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হতে পারে। জীবনের সবকিছু একদিকে আর জপ অন্যদিকে জপকে আঁকড়ে থাকার জন্য যা ত্যাগ করতে হয় সব করবে কিন্তু দেখতে হবে—মন থেকে জপ যেন কিছুতেই বিচ্যুত না হয়। তাই যে কোনভাবে জপ ধরে রাখতে হবে চিরকাল। কলিযুগে এই জপেই লাভ হয় সিদ্ধি। মানুষ জীবত্ব থেকে লাভ করে শিবত্ব এই জপের মাধ্যমেই।

— বেলুড় মঠের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বলতেন— ঈশ্বরের কোনে বিশেষ মূর্তি, যিনি আমার ইষ্ট দেবতা, তাঁর নাম বা মন্ত্র পূনঃ পুন আবৃত্তি করার নাম জপ। মন্ত্র মানে কী? যা আমাদের মনকে বাহিরের জগৎ থেকে টেনে এনে ভগবৎ পাদপদ্মে ধরে রাখে তাই মন্ত্র। আর বীজমন্ত্র হচ্ছে—যে মন্ত্র জপের দ্বারা অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হবে, যে শক্তির জোরে মানুষকে ধীরে দীরে ভগবৎ দর্শনের দিকে নিয়ে যাবে, সেই জন্য জপ করাটাই হচ্ছে মুখ্য ব্যাপার জপের ভিতর যে বীজমন্ত্র তার মধ্যে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। জপ না করলে সেই শক্তির স্ফুরণ হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন মৃত্যুর জন্য —ধ্যানের অর্থ হ'ল নিজের আদর্শকে নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিপথে জাগরুক রাখা নিষ্কলুষ দিব্যসত্তার ধ্যানে মগ্ন হতে হবে, চিত্তে তাঁকে ভাসিয়ে রাখতে হবে। —এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও স্মরণই সৎসত্তার প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ পূজা নিবেদন এবং সৎ সত্তাকে সন্তুষ্ট করার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য— এই হল পথ-এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যে কেউ জীবন পথে অগ্রসর হয় সকল দুঃখকষ্ট থেকে ত্রাণ পেয়ে অবশেযে সে পরম মোক্ষের (মুক্তির) সন্ধান লাভ করে।

এই নামরূপ মহামন্ত্র যা স্বয়ং মহাদেব জপ করতেন আর কাশীতে মুক্তির জন্য মহামন্ত্রের জপের উপদেশ দিয়েছিলেন।

মুনি-ঋষি-সর্বদেব ভক্তিযুক্তচিত্বে।
সদাই গাহিছে নাম ওঁঙ্কার ধ্বনিতে।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর করে নাম ধ্যান।
অবিরাম-অহ্নিশ স্মরে নাম গান।।

পার্বতীর হৃদয়ের প্রেম দেখে ভগবান শঙ্কর জগত মাতা পার্বতীকে নিজের আভুষণ বানিয়েছিলেন-এবং শিব এই অজপা বিদ্যা পার্বতীকে শিখিয়েছিলেন অজপা জপের উপদেশ দিয়েছিলেন—পার্বতীও শঙ্করের সহিত অজপা নাম জপ জপতেন। নামের প্রভাব-ভগবান শঙ্কর খুব ভালভাবে জানতেন, তাই সেই নামের প্রভাবে তিনি বিষপান করলেন আর তা অমৃত হয়ে গেল, তিনি নীলকণ্ঠ নামে পুজিত হলেন।

নাম জপের প্রভাবে গণেশ ঠাকুর প্রথম পূজনীয় অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা হলেন এটাই নামের প্রভাব।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন— শ্বাসে শ্বাসে নাম কর। কেনারাম-ভট্টাচার্যের কাছে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই শ্বাসে শ্বাসে মন্ত্রযোগ করেছেন। তিনি যদি শ্বাসে শ্বাসে নাম স্মরণ না করতেন, তবে ভক্ত শিষ্যদের সেই উপদেশ দিতেন না।

তাই ঠাকুর মৃত্যুর পূর্বে মাকে বলেছিলেন— তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে। শাক-ভাত খাবে আর নাম করবে। কারো কাছে চিৎহাত কর না। তোমার মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।

— শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর বলতেন— ভগবানের নামই সত্য, নামই শান্তি নামই আনন্দ, নামেই আশ্রয় লইলে অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না, কোথাও তীর্থে যাইতে হয় না। বেদপুরাণগত সুখ দুঃখও থাকে না। সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করিয়া অহেতু ভক্তি-নামের রুচি প্রদান করিয়া থাকেন।

... চিত্রপট সঙ্গেই থাকে, বিচ্ছেদ হয় না জানিবেন।

শ্রী অরবিন্দ লিখেছিলেন— দেবদেবীরা মানুষের কল্পিত নন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরাও আছেন ও মানুষের কাছে নিজের নিজের রূপ ধরে আসেন যদি মানুষ তাঁদের দর্শন চায় আরো লিখেছিলেন যে; তিনি নিজে কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।।

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, "ভগবানকে যে বরণ করে-ভগবান তাকে আগেই বরণ করেছেন—এ হল একটি সুমহান বাক্য, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।। ভগবান তোমায় চেয়েছেন, সেই দিব্যপুরুষ তোমায় নির্বাচিত করেছেন আর তাই তুমি তাঁর অনুসন্ধান করে বেড়াও।।

একটি নির্বাচিত আত্মা, সে সচেতন হয়েছে কারণ তার সময় এসেছে আর সময় যখন উপস্থিত তখন ফল মোটামুটি শীঘ্রই লাভ হবে। কয়েক মাসের মধ্যে তুমি একাজ করে ফেলতে পার, কিন্তু তুমি সাফল্য লাভ করবে নিশ্চয়ই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন— যে মহান যে দুরূহ কাজটি আমাদের সাধনার লক্ষ তা দুটি শক্তির সংযোগে কেবল সম্পন্ন হতে পারে।

(শক্তির-Power) — এক নীচে থেকে আবাহন করে যে স্থির অটুট আস্পৃহা (Aspiration) আর উপর হতে তাতে সাড়া দেয় যে ভগবৎ কৃপা (Grace)

... যে শক্তি উদ্ধের অনুমতি আর নিম্নের আহ্বান এই দুয়ের মধ্যবর্তী হয়ে উভয়ের আদান-প্রদান ঘটায় তাই ভাগবতী জননীর সত্তা ও শক্তি (Power) কোন মানবীয় প্রয়াস বা তপস্যা নয় এক মায়েরই শক্তি আবরণখানি ছিন্ন করতে পারে। আধারকে গড়ে তুলতে পারে, এই তমিস্রার মিথ্যার-মৃত্যুর বেদনার জগতে নামিয়ে আনতে পারে সত্য জ্যোতি-দিব্যজীবন, অমরের আনন্দ এ আস্পৃহা তাঁরই ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠে, তিনি যে বরণ করেছেন, না হলে তাঁকে চাইবার ইচ্ছাই বা আসবে কি করে? যতদিন পর্যন্ত নিম্নপ্রকৃতি সক্রিয় থাকে, ততদিন ব্যক্তিগত প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন তার তিনটি দিক আস্পৃহা (Aspiration) পরিবর্জন (Rejection) এবং সমর্পণ (Surrender) সক্রিয় থাকা চাই প্রকৃতিতে।

পণ্ডীচেরী আশ্রমের শ্রীমা বলেছেন-সহজ ভাবে কি করে সকল সময় নাম স্মরণ করা যায়? শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম ও চিন্তাকে গেঁথে নেওয়া কারণ শ্বাস কোন সময় বন্ধ হয় না। তাই কোন রকম কৌশল না করে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসে-শ্বাসে স্মরণ করতে হবে। কিছুদিন চেষ্টা করলেই অভ্যাসে পরিণত হবে। তবে চেষ্টায় কোন রকম ফাঁকি থাকলে হবে না।

শ্রীমা বলতেন— সকল সময় নাম করতে হবে। কখনো মুখে কখনো মনে। যখন মন শান্ত থাকে তখন মনে মনে এবং যখন চঞ্চল থাকে তখন মুখে মুখে। কারণ জোরে জোরে নাম করলে মনের অশুভ চিন্তা দূর হয়ে যায় মন শান্ত হয়।।

—ঃঃ—

# শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে

## আশুরঞ্জন দেবনাথ

ছুটিতে বাড়ি এসে স্বামীজির চিঠি পেলাম। নরেন্দ্রপুর থেকে ২০।৫। ৬৫ তারিখে লিখেছেন,

আশু,

তোমার চিঠি পেলাম। ৩০ শে 5th Sunday — সেদিন আমি কলকাতায় যাব না। হয় এখানে থাকব, নয়তো বাইরে কোথাও বেড়াতে যাব। সুতরাং ২৩ শেই দেখা করার চেষ্টা করো। স্নেহাশিস।

অনির্বাণ

সবে বাড়ি এসেছি। ভাবলাম কলকাতায় পরেই যাব। ২২ তারিখ বিকালে স্বামীজির চিঠি পেলাম। পরদিন ভোর পাঁচটায় গাড়ী না ধরলেই নয়। ভাগ্যিস চিঠিটা আসতে দেরী করেনি।

কলকাতা 'গোলপার্ক' পৌঁছুলাম বেলা দু'টায়। সাক্ষাতের সময় বিকাল পাঁচটায়। লেকের চারপাশে ঘুড়ে বেড়ালাম। বেঞ্চিতে বসে মাছের খেলা দেখলাম, স্বামীজিকে কি বলব, মনে মনে ভাবলাম। পৌনে পাঁচটায় দুরুদুরু বক্ষে কেঁয়াতলার দিকে রওনা হলাম। পাঁচটার মধ্যেই পৌঁছে দেখি স্বামীজির ঘরে অনেক ভক্ত—অনুরাগী। বারান্দায় একটা চৌকী পাতা ছিল। ওখানে বসে সাত-পাঁচ ভাবছি। ঘর ভর্তি লোক, ঢুকতেও সাহস হচ্ছে না। মিনিট পনেরো পর এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলে স্বামীজির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "স্বামীজি তো অনেকক্ষণ বসে আছেন। ভিতরে যান। আপনারই তো আসার কথা ছিল। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? *** ***" আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলাম। ভীর অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। একটুক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে স্বামীজিকে প্রণাম করে একপাশে বসলাম। স্বামীজির তখন আমার সমবয়স্কা এক তরুণীর সাথে বেদের আলোচনা করছেন। বড় সুন্দর উচ্চস্তরের সে আলোচনা। মেয়েটির জ্ঞানের গভীরতার যে সামান্য পরিচয় পেলাম। তাতে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। নিজের দিকে চেয়ে মনে হল, কোথায় পড়ে আছি! যেসব আলোচনা কমই বুঝেছি, যতটুকু বুঝেছি তাও লিখে রাখার দুঃসাহস করিনি। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজি বলেছেন, "বেদের অনুবাদ হয় না। *** আবৃত্তিতে মন্ত্রের মর্ম আপনি প্রকাশপায়। ** **" প্রসঙ্গত বলছি, স্বামীজি প্রণীত বেদ ব্যাখ্যান Compendium) " বেদ মীমাংসা" তিন খণ্ড (সম্পূর্ণ লিখে যেতে পারেননি) কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজি সে কলেজের Honorary Research Fellow ছিলেন। উপনিষদ গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত।

নীরব শান্ত পরিবেশ; টুঁ শব্দটি নেই। মাথার উপর পাশ ছুড়ছে, ঘরের কোণে একটা আলো জ্বলছে। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। দেখালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বুদ্ধের ছবি। ভক্ত সংখ্যা কমে এসেছে। চুপচাপ বসে আছি। আমিও অনেক ভদ্রলোক। স্বামীজি কিছু বলছেন না। মিনিট পনেরো কেটে গেল। স্বামীজি ইতি মধ্যে দু' মিনিটের জন্য বাইরে গেলেন, জল খেলেন। বসে

আছি, ঘরে আমি একা। এবারে স্বামীজি বললেন "বল, তোমার কি বলার আছে।" সামনে একটু এগিয়ে বসলাম; তারপর আস্তে আস্তে বললাম, "সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত বসি। বসে ভাবি দেহটি যেন পাষাণের মত পিষ্ঠ যে শান্ত আবার অভ্রজ্যোতিতে পূর্ণ। 'ওঁ' জপ প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে করি। শ্বাস নেবার সময় ভাবি ব্রহ্মজ্যোতিতে ভিতরটা পূর্ণ হচ্ছে; আবার প্রশ্বাসে ওই জ্যোতি অনন্ত আকাশে লীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বামীজি জ্যোতি সমুদ্রে ডুবতে পারছি কই? স্বামীজি আশ্বাস দিয়ে বললেন, "এত সহজে কি হয়? তাহলে আর লোকে যুগ-যুগ পাহাড়ে পর্বতে কাটিয়ে দেয় কেন? বাবারে, সারাটা জীবন তো গেল এই করে, তুমি আর ক'দিনের। ধৈর্য্য হারা হইও না। সাধনায় কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না। এই হল বীর্যের পথ, আরামের পথ তো নয়। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। আমি তোমাকে উপদেশই দিতে পারি। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ তোমাকেই করতে হবে। ***"

বললাম, স্বামীজি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে ধ্যানে চিন্তা করতে পারি? স্বামীজি বললেন, ধ্যানের প্রথমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে স্বচ্ছন্দে চিন্তা করতে পার। তবে কেবল মূর্তি চিন্তা না করে তাঁদের চিত্তের বা ভাবের ধারণা-কববার চেষ্টা করো। তাঁরা কি ছিলেন, সবসময় কি ভাবনায় থাকতেন, তাই বোঝবার এবং ধারণা করবার চেষ্টা করো। ***

জিজ্ঞাসা করলাম বাইরের জগতের সাথে আমার-সম্পর্কটা কেমন হবে? কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব আমায় বড় সেকেলে মনে করে, অনেকটা কৃপার-চোখে দেখে। স্বামীজি বললেন, সবার সাথে মিলেমিশে থাকবে। কে কি বলল, তাতে তোমার কি আসে যায়। তুমি তোমার কাজ করে যাও। তোমার আদর্শে তুমি অবিচয় থাক। তোমার মত প্রতিপন্ন করায় কোন দরকার নেই। সবকাজ সুষ্ঠভাবে সময় মত করবে। — পিয়মানুবর্তিতা মেনে চলবে?

অথ মার্কসবাদ ঃ

সময়টা ১৯৬৪-৬৫ সাল। থাকি নকশাল আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরে একটি রেলওয়ে মেঘে। নকশাল আন্দোলন তখন তুচ্ছে। "চীনের চেয়ার ম্যান আমাদের চেয়ারম্যান," "বন্দুকের নলই শক্তির উৎস" শ্লোগান আকাশ-বাতাস মুখরিত; পোষ্টারে পোষ্টারে চারদিকে ছয়লাপ— কোনও বাড়ির কিংবা প্রতিষ্ঠানে দেয়াল ফাঁকা নেই। সহকর্মী বন্ধুবান্ধবদের হাতে হাতে চীন থেকে প্রকাশিত মার্কস-মাতসেতুং এর বাণী সংকল্প 'Red Roon' । আমার ঘরে বইয়ের রেকে রবীন্দ্র রচনাবলীও স্বামীজির বাণী ও রচনাবলীর শতবার্ষিকী সংস্করণ, দেয়ালে ঠাকুর-স্বামীজি-মায়ের ছবি—যাদেশে বন্ধুরা উপহাস করে। এ হেন পরিস্থিতিতে খানিকটা নিরাশ হয়েই স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভারত সংস্কৃতির উপর আজ এক কঠিন Challenge পিয়ে এসেছে মার্কসবাদ; এত প্রাচীন একটা সভ্যতা এবারে কি বিলীন হয়ে যাবে? স্বামীজি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, "এসব তোমার অনীক কল্পনা। প্রতি যুগেই অবিশ্বাসীরা থাকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাথে নবদ্বীপের ক'জন গিয়েছিলেন?

কেঁয়াতলা, কলকাতা। ২৩.১.৬৫, রবিবার। ৪র্থ দর্শন। আসার আগে স্বামীজির চিঠি পেলাম। ১৪।১।৬৬ তারিখে হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর থেকে লিখেছেন,

"আমি এমাসে কলকাতায় থাকব ১৬ই আর ২৩শে মাত্র। এর মধ্যে ১৬ই বিকালে class থাকবে। ২৩ শে ৫টার পর কেয়া তলায় দেখা হতে পারে। আমি সাতটায় আবার নরেন্দ্রপুর চলে আসব। এমাসে আর কলকাতায় যাব না। নরেন্দ্রপুর-দেখা করবার সময় সন্ধ্যা ৫টা হতে ৬টা পর্যন্ত— বুধবার ছাড়া অন্যদিন। ২২শে শনিবার কলকাতা যাব বটে, কিন্তু ভীষণ উপলক্ষে অন্যত্র থাকব—কেঁয়াতলায় নয়।" এরপর লিখেছেন,

কেঁয়াতলায় স্বামীজির কাছে যখন পৌঁছালাম, বিকাল তখন ৫টা স্বামীজি তখন ক্লাস পিচ্ছেন, একটি মেয়েকে উপনিষৎ পড়াচ্ছেন। মেয়েটি তন্ময় হয়ে শুনছে লিখছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। ভাবছিলাম-জন্ম-জন্মান্তরের কত সুকৃতি থাকলে স্বামীজির কাছে উপনিষৎ শিক্ষার এমন সৌভাগ্য হয়। ধন্য মেয়েটি, ধন্য তার শিক্ষানুরাগ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি তার বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। স্বামীজিও এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসন ইজি-চেয়ারে বসলেন, যে আসনে বসে স্বামীজি সাধারণত! কথাবার্তা বলেন। প্রণাম করে স্বামীজির সামনে বসলাম। ঘরে আরেক ভদ্রমহিলা ছিলেন। স্বামীজির সাথে দু'চার কথা বলে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে আমি একা। স্বামীজি আমায় বললেন, "বল, তোমার কি বলার আছে?" কোথা থেকে শুরু করব তাই ভাবছিলাম। স্বামীজি এবারে নিজেই শুরু করলেন, "তোমার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা দেখা দিয়েছে বলে। বললেন উপনিষৎ পড়েছি কঠোপনিষদে বড় সুন্দর একটা কথা আছে, শ্রেয় আর-প্রেয়। প্রেয় থেকে প্রেয়সী— থাকে আমার ভাল লাগে। প্রেয়কে ছাপিয়ে শ্রেয় ভাবনা। শ্রেয় আমাকে আশ্রিত করে রয়েছে— আত্মার শ্রী, শ্রেয়সী। নারীর মধ্যে শ্রেয়সী রূপও আছে। আমাদের দেশের সাধনার ধারায় নারীকে দেখেছে মাতৃরূপে।

—ঃঃ—

# অন্তর মাঝে তাকে পাওয়া যায়

## সায়ক ঘোষাল

জগতের মধ্যে থেকে ভগবৎ ভাবে জীবন যাপন করার মাধ্যমেই ব্রহ্ম লাভের হদিশ পায়ো যায়। সে ব্যক্তি জগতের মধ্যে থেকে জগতের সব বাধা বেড়াজালের মধ্যে প্রভাবিত না হয়ে মনে ভগবৎ ভাবনা এবং আনন্দ নিয়ে কর্ম করে চলে তার ব্রহ্মলাভে কোনো দিনই বিলম্ব হয় না। জগতে অনেক কিছুই আছে যা আমাদের মনকে বিচলিত করে দেয়। কিন্তু সে এই সব কিছুর প্রত্যাখান করে ভগবানের দেওয়া নির্দেশকে একভাবে মেনে নিজের জীবনের সমস্ত কিছু ভগবানকে নিবেদন করে তাকে সদা সর্বদা আহ্বানের পথে এগিয়ে চলবে, সেই পারবে জগতের মধ্যে থেকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে— "হে পার্থ এই মনুষ্য দেহ হল মুক্তির পরম ভূমি তাই মনুষ্য জন্ম সবথেকে শ্রেষ্ঠ, ভগবৎ পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনুষ্য জন্মই প্রকৃত উপযুক্ত এবং পরম সাহায্যকারী ক্ষেত্র রূপে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। যে পারবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে এগিয়ে যেতে ভগবৎ আহ্বানে তখনই তার মুক্তির ক্ষেত্র উন্মোচনের সূচনা হয়ে যাবে।"

Human experience was proven the incidence of the next higher-orderness on fulfillment of one kind. It is the adding fuel to fire. One question need gives birth to another need. When a person reaches the level of self-realization, they remain indifferent to or are unffected by the current of events.

External factors are no doubt contable and important, but more important are the set of internal factors. An individual who is autonomous by faith and conviction can sweep over the external stressing factors more easily than another type of individuals. (Stress management through mind Engineering, 2024, Pg-11, Prof. Dr. Ramaprosad Banerjee)

জগৎটা সবকিছু নিয়েই তৈরি, ভালো মন্দ, আলো অন্ধকার, পাপ পূণ্য, অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোকে বোঝাও যায় না ঠিক সেরকমই শুধু আলো আলোর মধ্যে থাকলেও অন্ধ হওয়া অনিবার্য। তাই সব কিছুই ভগবান রেখেছেন ভারসাম্য বজায়ের নিরীক্ষে। কিন্তু আবার ভগবান মানুষকে সুযোগও করে দিয়েছেন নিজের ইচ্ছা মতো জীবনধারণের। জগতের সব কিছু নিয়েই চলতে হবে। জগতের বাধা আসবেই আর সেগুলি প্রভাবিত করবেই কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় আছে। কেউ কোনো ছাত্রের অধ্যয়নের সময় যদি জোড়ে জোড়ে বাদ্য যন্ত্র বাজায় তাহলে তার মন অমনোযোগী হবেই। কিন্তু সেইভাবে প্রভাবিত হতে হতে সে যদি নিজের অন্তরে সুপ্ত হয়ে থাকা ইচ্ছা শক্তির আর বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে তাহলে কেউ তাকে অধ্যয়ন করা থেকে আটকাতে পারে না। ঠিক এইভাবে সে হয়ে ওঠে একজন মেধাবি ছাত্র। ঠিক এইভাবেই জগতের কত নানা বাধা থাকবে কত জিনিস মনকে প্রভাবিত করে কিন্তু মন যদি তার অন্তরে থাকা ভগবানের দিকে বিশ্বাস আর ভক্তি থেকে অনড় অটল থাকে তাহলে সে হয়ে ওঠে এক প্রকৃত ভক্ত যার বুদ্ধি, জ্ঞান ব্রহ্মানন্দে স্থিত। ভক্তই পারবে বেছে নিতে তার জন্য উপযুক্ত সম্বল ভগবৎ ভাবকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই জগতেরই মধ্যেই। আর এই জগৎটাই ভক্তের অন্তরেই স্থিত। ভক্তের অন্তরে ভগবানের সন্ধান পাওয়া যাবে। যদি সে সত্যি ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে অন্তরে আহ্বানে সচেষ্ট তাহলে সে ঠিক পারবে ভগবানকে অন্তরে খুঁজে পেতে।

—ঃঃ—

# আবাহন করি তোমায় হৃদয়রাজ

## তানিয়া ঘোষাল

মানবিক চেতনের ভাগবতী চেতনে রূপান্তরের পর্ব শুরু হয় ভগবানকে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হল কারণ এই সমগ্র সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি একটি নিয়মে বেঁধে দিয়েছেন। যে নিয়মে গোটা সৃষ্টি চলছে। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে সেই নিয়মে। এই সৃষ্টির কোণায় কোণায় তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। আবার নানা ধরনের সব আকর্ষণীয় জিনিস তিনি তৈরী করে রেখেছেন যা আবিষ্কারের লোভে মানুষ প্রতিনিয়ত দৌড়ে চলেছে। অর্থাৎ তিনি সবাইকে সেই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন যে, কেউ তাঁকেও জীবনে লাভ করার অভীপ্সা রাখতে পারে, আবার কেউ কেবলমাত্র জাগতিক কাজকর্ম, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে।

যে তাঁকে এবং একমাত্র তাঁকেই চেয়েছে তিনি তাকে নিজ আলোয় ভরিয়ে দিয়েছেন। চাওয়ার বা নির্বাচনের পর্ব যখন মিটে যায় যখন মন সেই সত্যের পথকেই নিজের ultimate destiny হিসাবে বেছে নেয় তখনই শুরু হয়ে যায় মানবমন থেকে সাধকমন

হয়ে ওঠার যাত্রাপথ। যখন এ মন তাঁকেই বেছে নেয়, তাঁকে জানবার পথে চলতে চায় তখন তিনি হাত ধরে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে চলেন। যে ভাগবতী প্রেরণার মাধ্যমে মন ভাগবতী পথে পা বাড়ালে সেই মনেই ভাগবতী প্রেরণা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। এই যাত্রাপত্রের প্রথমেই আসে বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকে একটু একটু করে ভালোবাসা তৈরী হয়। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, দৃঢ়, অচল, অটল বিশ্বাস, হাজার বছরের বটবৃক্ষের মত বিশ্বাস হওয়াটা কিন্তু একদিনের ব্যাপার নয়। যদিও ভগবানের কৃপায় সব সম্ভব কিন্তু তিনি চান তাঁর ভক্তকে নানান ধরনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির সম্মুখীন করে সেই ভগবতী বিশ্বাসকে হাজার বছরের বটবৃক্ষের মত দৃঢ় করে গড়ে তুলে দেন।

ভাগবতী উপলব্ধির সেই প্রচেষ্টা হল একটা যাত্রাপথ সেখানে নানাধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় প্রাণকে। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক তিনি নিজে এসে ধরিয়ে দেন। কখন তিনি নিজে এসে ধরিয়ে দেন ঠিকটা, কখনও আবার ভুল করতে দেন সার্বিক প্রাণকে যাতে সেই ভুল থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভাগবতী পথে চলতে চলতে সেই সাধক মনের তখন ভ্রম হতে পারে কখনও সে সেই মন হয়ত পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে তার ভগবানের প্রতি। সেই সাধক প্রাণ মনে করে সে এইবার ভগবানকে পুরোপুরিভাবে লাভ করবার জন্য যোগ্য হয়ে উঠেছে। Over confident হয়ে যায় সেই সাধক প্রাণ। কখন তার মনে একটা প্রচ্ছন্না আবরণ উৎপন্ন হতে পারে তার ভাগবতী বিশ্বাস নিয়ে, যা ভাগবতী পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সেই সময় তিনিই রক্ষাকর্তা হয়ে আসেন। কোনো ঘটনা কোনো চিন্তা, কোনো উপলব্ধির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে বিশ্বাসটা এখনও half রয়েছে। এখনও দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। সাধক প্রাণকে আরো চেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে বিশ্বাস এই পরিস্থিতিতে সাধকের মনে দুরকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সে ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে চলা, নেতিবাচক ক্ষেত্রে সাধক অনেক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে হয়ত তার চলাটাই স্তব্ধ করে দেয়। তাঁর মনে হয় তার দ্বারা ভগবানকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা হয়ত সম্ভব নয়। ঠিক এই পরিস্থিতির জন্য ঋষি একটি উপদেশ দিয়েছেন, Do not look back, look forward. পিছনে তাকিও না, যা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। কখনো মনে হয় এই তো তিনি খুব কাছেই আছেন। আবার কখনও হয়ত জাগতিক চিন্তার ভিড়ে ভাগবতী উপলব্ধি কোথায় হারিয়ে যায়, আসলে তিনি কোথাও হারিয়ে যান না, তিনি সদা সর্বদা অন্তর গুহাতে নিজ মহিমায় বিরাজমান। আকাশে মেঘ জমলে যেমন সূর্যদেবের দর্শন আর পাওয়া যায় না তেমনি মনের আকাশে চিন্তার মেঘ ভীড় করে এলে তিনি লুকিয়ে পড়েন। যখন সব মেঘ কেটে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন তাকে সেই আকাশে স্পষ্ট দেখা যায়। ক্ষণিকের বিরহ বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে সাধকমন ভগবৎ দর্শনে আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সাধকজীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণে, সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগবতী নামধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে। সেই ধ্বনি সাধক মন প্রাণ হৃদয় জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই ধ্বনির আবেশে সাধক মন পুলকিত হতে থাকে। এই জগতে শরীর থেকেও সেই সাধকপ্রাণ যেন বিচরণ করে ভাগবতী ভাবজগতে। সাধক প্রাণের কাছে ভাগবতী ভাবনা তখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ভাগবতী ভাবনায় ডুবে গিয়ে সেই মন যেন ভাগবতী মনই হয়ে ওঠে। ভাগবতী গুণ এ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই মন। একসময় যে মনের কাছে জাগতিক চাওয়া পাওয়া, লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একসময় যে মন জাগতিক সুখে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়ত, এখন সেই মন ভাগবতীভাবে সদা আনন্দিত হয়ে থাকে। জাগতিক সুখ এই মনকে প্রভাবিত করতে পারে না। দুঃখ তাকে ছুতে পারে না কারণ সেই সাধক মন তখন সচ্চিদানন্দের অতল সাগরে ডুবে রয়েছে। ঠিক যেমন ডুবুরী সমুদ্রের মাঝে মুক্ত খুঁজতে যায় তখন জলের উপর কি হচ্ছে বুঝতে পারে না, তেমনি যেমন সচ্চিদানন্দের অতল সাগরে ডুবে রয়েছে তার পক্ষে সুখ-দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব হয় না। সাধক মন ডুব সাগর দিতে দিতে চলে যায় সেই গভীর তলদেশে। খুঁজে ফেরে তার আরাধ্যর পরশটুকু। যদি একটু তাঁকে ছোঁয়া যায়, যদি একটু তাকে দেখা যায়। তিনি কেমন তা জানতে ইচ্ছা করে বড়। আচ্ছা সেই সাধক মনকে দেখে কি তিনি খুশি হবেন খুব, আনন্দে কি তিনি আলিঙ্গণ করবেন, তিনি কি বলবেন— 'এই আসার সময় হল কবে থেকে সেই অপেক্ষায় বসে আছি।' একটু কি কপট রাগও দেখাবেন। আবার ভালোবাসবেন। নিজের হাতে খাইয়ে দেবেন, কোলে তুলে বসাবেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন, আনন্দে খুব করে জড়িয়ে ধরবেন, সাধ্য আর সাধন কি তখন মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। কত পথ অতিক্রম করে তাঁকে পাওয়া, দুদিকের অপেক্ষার কি সমাপ্তি ঘটবে। তাঁকে আরো আরো বেশি করে জানতে পারার পথটি কি প্রশস্ত হবে। আসলে তাঁকে জানবার তো কোনো শেষ নেই। তিনি খুব কাছেই থাকবেন, জগতের সর্বত্র যে তিনিই বিরাজিত এই তত্ত্ব তখন বিশ্বাস থেকে উপলব্ধির পর্যায়ে নেবে আসবে। জগৎ এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা মিশেমিশে একাকার হয়ে যাবে, যে মনে এতদিন ছিল নানা চিন্তার সমারোহ, ভক্তির বিপুল স্রোত সেই সব চিন্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। থেকে যাবেন কেবল তিনিই একমাত্র হয়ে। সব জাগতিক ভাবনা এসে মিশে যাবে ভক্তির স্রোতে। মনের প্রেক্ষাপট ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। মন, প্রাণ, হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর হয়ে উঠবে ঐ ভক্তিরসে, হৃদয়ের সবটা জুড়ে তিনিই বাস করবেন।

—ঃঃ—

# সত্যের পথ

## প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st January 2024
Poush–1430
Vol. 21. No. 9

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

# দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

**অন্‌-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—**

রবিবার : ৭ই জানুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৪ই জানুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২১শে জানুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৮শে জানুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
**Website** দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.